KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ১৩ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড,
Collection : KLMLGK	Publisher : বিক্রম মুখোপাধ্যায়
Title : পত্রিকা	Size : 6" x 9.5" 15.24 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 1/7 1/8-10 1/11 1/12	Year of Publication : ফাল্গুন, ১৩৮৬ চৈত্র- জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬-৮৭ আষাঢ়, ১৩৮৭ শ্রাবণ, ১৩৮৭
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : বিক্রম মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চৌধুরী	Remarks : VOL & NO. 1/7 ফাল্গুন, ১৩৮৬ 333 - 340 Page Missing

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
...মার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম বর্ষ পরিচয় শ্রাবণ
দ্বাদশ সংখ্যা সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র ১৩৪৭

বঙ্কিমচন্দ্র ও সাম্যবাদ

হরিপ্রসন্ন মিশ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত রচনা সম্বন্ধে বহুস্থানে বহু আলোচনা হ'য়ে গেছে। তবু একটি কথা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি রচনা সম্বন্ধে আমরা প্রায় উদাসীন। উদাহরণ স্বরূপ বঙ্কিমের সাম্যবাদ সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলির নাম করা যেতে পারে। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে সাম্যবাদ যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, সে কথা অস্বীকার করা চলে না।

রবার্ট ওয়েনের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে Socialism শব্দ যেদিন প্রথম ব্যবহৃত হয় তার থেকে তিন বৎসর পরে বঙ্কিমের জন্ম ও বিখ্যাত মনীষী কার্ল মার্কস্-এর মৃত্যুর দশ বৎসর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। এ থেকেই তাঁর জীবনকালে সাম্যবাদ যে জগতের চিন্তারাজ্যে একটা বিশেষ আলোড়ন এনেছিল তা' অনুমান করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আন্দোলন বিশেষ প্রবল হয়ে উঠেছিল। ডিরোজিও প্রভৃতির শিক্ষায় ও কেশবচন্দ্র প্রভৃতির প্রচেষ্টায় Individualism-এর স্বপ্ন বাঙ্গলার তরুণ সমাজকে আলোড়িত করে' তুলেছিল। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে এ আন্দোলন বহুলাংশে মন্দীভূত হয়েছিল, তবুও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। এই সময়ে, ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যাতেই বঙ্কিম 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 'সাম্য' প্রবন্ধও এই সময় অর্থাৎ ১৮৭২ হ'তে ১৮৭৬ সালের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। এ সময় নীলকরদের অত্যাচারে বাঙ্গলার কৃষকবৃন্দ বিশেষভাবে নিপীড়িত হচ্ছিল এবং দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'ও এই সময়েই প্রকাশিত হয়। 'নীলদর্পণ' তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে যে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল তার যথেষ্ট পরিচয় আমরা পেয়েছি, এবং এর ফলে লং সাহেবের কারাদণ্ড হয়েছিল বলে' জানা যায়। এই সময়েই কৃষক বিদ্রোহ হয়—এবং তার ফলে গভর্ণমেণ্টকে Indigo Commission বসাতে হয়। এদের কথা মনে রাখলে বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদ বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদের নীতি বুঝতে হ'লে তৎকালীন য়ুরোপীয় সমাজের সাম্যবাদের রূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্রের মতবাদের সঙ্গে তৎকালীন য়ুরোপীয় সমাজের

সমাজতন্ত্রবাদীদের মতামতের কতটা সাদৃশ্য ছিল তা' এর থেকেই অনেকটা বোঝা যায়। অর্থ, বর্ণ ও শ্রেণীগত পার্থক্যের ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ক্রমশঃ বেড়েই চলছিল। দুঃখ, দৈন্য, নৈরাশ্য ক্রমশঃ মানুষের জীবনে স্থায়ী আসন লাভ করেছিল, এবং সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা শব্দগুলি শব্দ মাত্রেই পরিণত হয়েছিল। এই বৈষম্যকে দূর করবার জন্য রুশো যে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন তারই ফলে ফরাসী বিপ্লব। বহুকাল ধরে' মানুষ অত্যাচারী শাসক সম্প্রদায়ের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য উৎসুক হ'য়ে উঠেছিল। তাদের অন্তরে রুশোর Equalityর স্বপ্ন গভীর প্রভাব বিস্তার করলে। কিন্তু ফ্রান্সের অগণিত নরনারীর রক্তদানে যে-বিপ্লবের অবসান হ'ল, তার ফল মোটেই আশাপ্রদ হ'ল না।

এর পরের স্তরে এলেন রবার্ট ওয়েন, সেণ্ট সাইমন, কুরিয়ার প্রভৃতি মনীষীরা। এঁরা সমাজকে নূতনভাবে সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। কিন্তু এ-আন্দোলনও জন-আন্দোলন নয়, কারণ এঁদের মতবাদ কেবল Middle Classদের জন্যেই, সত্যিকারের সর্ব্বহারা সমাজের সঙ্গে এঁদের কোনো সম্পর্কই ছিল না বললেই চলে। এঁরা মানুষের জীবনে সাম্যনীতি একমাত্র শিক্ষা ও সৌভ্রাত্রের উপর নির্ভর করে বলে' বিশ্বাস করতেন। তাঁরা সকলেই ভূমি, ধন বা যন্ত্রকে সাধারণের সম্পত্তি বলেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন—শুধু পার্থক্য এঁদের উৎপন্ন পণ্য বিভাগের বেলায়। এঁদের কারো কারো মতে প্রত্যেকে তার প্রয়োজন মত উৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করবে, আবার কেউ বা প্রত্যেকের শ্রমানুযায়ী ভোগের পক্ষপাতী।

এঁদের পরে এলেন কার্ল মার্কস। মার্কস বললেন মানুষের সামাজিক জীবন, ধর্ম্ম, শাসনব্যবস্থা সব কিছুই তার আর্থিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। এই ধন বৈষম্যের ফলে শ্রেণীবৈষম্য। মানুষের বর্ণবৈষম্যের-মূলেও আবার এই শ্রেণীবৈষম্য ও তার ইতিহাস এই শ্রেণীসংগ্রামেরই ইতিহাস। জগতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে শ্রেণীবিভাগ থাকবে না, প্রত্যেকের যথাশক্তি শ্রম করতে হবে। ভূমি, মূলধন প্রভৃতি সব কিছুই সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি বলে' পরিগণিত হবে। পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিক বা শোষিত জনগণকে এক হ'য়ে শাসনব্যবস্থা হাতে নিতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র বৈষম্যকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করেছেন : (১) প্রাকৃতিক (২) অপ্রাকৃত। প্রাকৃতিক বৈষম্য স্বীকার করে' তিনি বলেছেন, 'সংসারে বৈষম্য থাকাই উচিত। প্রকৃতিই অনেক বৈষম্যের নিয়ামক।' প্রাকৃতিক বৈষম্যকে স্বীকার করেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদীরা মতবাদ প্রকাশ করেন। বঙ্কিম অপ্রাকৃত বৈষম্যকে চার ভাগে ভাগ করেছেন : (১) বর্ণগত (২) অর্থগত (৩) স্ত্রী-পুরুষের অধিকারগত (৪) রাষ্ট্রীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'সামাজিক উন্নতিবোধ বা অবনতিবোধের যে সকল কারণ আছে অপ্রাকৃত বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান।' এদের মধ্যে অর্থগত বৈষম্যকেই তিনি সব চেয়ে গুরু মনে করেছেন। কার্ল মার্কস আর্থিক অবস্থার সঙ্গে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার যে সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাই নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে মানুষের উন্নতি বা অবনতির বিশেষ কারণ এই অর্থগত বৈষম্য। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও তাঁর এই একই মত। তিনি

বলেন, 'ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার আদি কারণ। ঐহিক সুখে নিস্পৃহতাই ভারতবর্ষের আর্থিক অবনতির কারণ। এদেশের ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তৃক যে নিবৃত্তিজনক শিক্ষা প্রচারিত হইল, বর্ত্তমান দেশের অবস্থাই তাহার মূল।' পূর্ব্বেই আমরা বলেছি অর্থগত অবস্থা হ'তে মানুষের শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণী হ'তে বর্ণের উৎপত্তি। এই বর্ণ-বৈষম্য বিশেষ ভাবেই লক্ষিত হয় ভারতবর্ষে।...

বঙ্কিমচন্দ্র অর্থগত বৈষম্য দূর করার জন্য রবার্ট ওয়েন হ'তে First International পর্য্যন্ত অর্থাৎ মার্কস্ পর্য্যন্ত সমস্ত সমাজতন্ত্রবাদীদের মতামত বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তিনি উৎপন্ন পণ্য বিভাগের বেলায় কোন বিশিষ্ট মত গ্রহণ বা প্রকাশ করেন নি। তিনি এঁদের মত বিরোধের কথা উল্লেখ করেই নীরব হয়েছেন।

বর্ত্তমানে যাকে 'শ্রেণীসংগ্রাম' বা Class Struggle বলা হয় তার সম্বন্ধে বঙ্কিম বলেছেন, 'উন্নতিশীল সমাজে সামাজিকেরা পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া এই বৈষম্যকে অপনীত করিয়াছেন। প্রয়োজন হ'লে—ক্ষত-চিকিৎসায় অস্ত্রাঘাত যেমন ইষ্টসাধন করে' থাকে, তেমনি দরকার হ'লে—সামাজিক অনিষ্টের দ্বারাও ইষ্ট সাধন করা উচিত, সে কথা তিনি স্বীকার করেছেন। স্ত্রী-পুরুষের অধিকার সম্পর্কে বঙ্কিম সমাজনীতি সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এ যদি অধর্ম্ম না হয় তা'হলে অধর্ম্ম কাহাকে বলে বলিতে পারি না।' নানা কারণে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিশদ আলোচনা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। শুধু এর উল্লেখ মাত্র করে' প্রবন্ধ সমাপ্ত করেছেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও Evolutionist Socialistদের সঙ্গে তাঁর মতের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখলে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। *

* মালদহ সাধারণ পাঠাগারের বঙ্কিম স্মৃতি-সভায় পঠিত।

ছাদ

বীরেশ্বর বিশ্বাস

বাড়ীর পাশে খানিকটা জমি অনেক দিন থেকে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে হরিনাথ ভেবেছেন এই জমিটা মেজে-ঘসে একটা মনোহর বাগানে পরিণত করবেন। কারণ তাঁরই বাড়ীর পাশে ঐ জমিটায় বেখাপ্পা ধরণের কতগুলো ভাঙা একতলা বাড়ী আর তার কিছু দূরে অন্ধকার বস্তি থেকে যে বিকৃত কোলাহল ভেসে আসে তা হরিনাথের নির্বিবাদী মনেও বিতৃষ্ণা এনে দেয়। তাই তিনি প্রায়ই অস্বাভাবিক চঞ্চল হয়ে ওঠেন: কিন্তু অনেক কাজ আর কর্তব্যের চাপে আস্তে আস্তে মনের গতি ফিরে আসে। আহা, কতগুলো ভবঘুরে জীবন ত, বর্ণহীন সম্বন্ধে ওরা পরস্পর জড়িয়ে গেছে। ওদের দিনরাত্রের ঝগড়া আর চীৎকার খুবই স্বাভাবিক! গরীবদের উপর হরিনাথের চিরকালই এমনি একটা মায়া আছে। এটা নতুন নয়, যখন তিনি সবেমাত্র ঐশ্বর্য আর সম্মান সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেছেন তখন থেকে।

আজও কী যেন একটা গোলমাল বেধেছে। একতলার প্রায়-ধ্বসে-পড়া বাড়ীগুলো থেকে নয়, তার কিছু দূরে ঐ বস্তি থেকে। রাগে হরিনাথের মাথার শিরা দপদপ করে, কোনমতে দেহটাকে টেনে হেঁচড়ে ছাদে আনেন। এখন বয়স হয়েছে, একটু উত্তেজনা এলে সমস্ত দেহ টলে আর ডান পা'টা এত বেশী কাঁপতে থাকে যে সেই মুহূর্তেই তাঁকে স্থানকাল বিবেচনা না করে যেখানে সেখানে বসে পড়তে হয়। বাতের দোষ। বুড়ো বয়সে বাতের দোষে তিনি একেবারে অথর্ব হয়ে পড়েছেন। তারপর দুর্ভাবনা ত আছেই। অসংখ্য জটিল মনের ক্লান্তি! কিন্তু ওদের জন্যে দুর্ভাবনাও কী তাঁর শান্তি আছে! কেন ওদের এত গণ্ডগোল? হরিনাথ বুঝি পাগল হয়ে গেছেন। অফিসরুমে তাঁর অন্যান্য কাজ চাপা পড়ে আছে: একটা মুহূর্ত পর্য্যন্ত তাঁর বেহিসাবী খরচ করা চলে না আর তিনি কিনা এই শরীর নিয়ে তিনতলা থেকে চারতলার ছাদে ক্রমাগত ছুটোছুটি করছেন। এই অভ্যাসটা আজকাল মুখর হয়ে গেছে, কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে খাতাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করবার পরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। খানিকক্ষণ ঘরে পায়চারী করেন, তারপর আসেন ছাদে।

কিন্তু তবু কী নিস্তার আছে? দু'মিনিটের মধ্যে সমীর খাতা বগলে হাজির। হরিনাথ ক্রুদ্ধ হন বৈকি! কিন্তু প্রকাশ করেন না। সমীর বিশ্বাসী ভৃত্য, তিনি ওকে আন্তরিক স্নেহ করেন। অভাবের তাড়নার মধ্যে পালিত হয়েও মানুষ যে এত বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে এটা তিনি শুধু সমীরের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন।—কী চাও সমীর?

'আজ্ঞে দু'টো সই দিতে হবে আপনাকে।'

'দাও খাতাটা,' হরিনাথ ক্ষিপ্র হাতে সই করেন, পার্কার পেনটা বুঝি দুমড়েই যায়।

'স্যর, আপনি হটাৎ চলে এলেন, যশোমন্ত লালের নতুন পার্টিটার কি ব্যবস্থা করবেন সে সব...'

'পরে হবে, তুমি নিচে যাও সমীর, হটাৎ আমার মাথাটা কেমন যেন করছে, কী বলছ··· না না ডাক্তারের দরকার হবে না, তুমি যাও কাজ করগে, আমি একটু পরে যাচ্ছি, উঃ, সো টায়ার্ড!'

সমীর নিচে নেমে যায়। হরিনাথ কিছুক্ষণ অবাধ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে থাকেন। হটাৎ মনে কী রকম যেন বিকার আসে। নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই শক্ত ইঁটের দেয়ালে বার কয়েক ঘুঁসি মারেন। এটা কী মুদ্রাদোষ না একেবারে দুরারোগ্য ব্যাধি? হরিনাথ কিন্তু নিজের মনে এক বিজাতীয় আনন্দ পান। নিজের উৎসাহ আর সামর্থের এই স্বতঃস্ফূর্ত গভীর প্রকাশকে যে স্বেচ্ছায় তিনি হাস্যকর করে তুলেছেন তা কোন সময়েই ভাবতে চান না: এত সহজ কথাটা ভাবতে তাঁর এই দুর্বলতার জন্যে কোন সময় হয়ত তাঁর দমিত সচেতন প্রবৃত্তিও বিদ্রোহী হয়। হাতখানা বড় বেশী টনটন করে।

ইঁটের দেয়াল খুব কঠিন আর নির্মম; কেন মাঝে মাঝে তাঁর এ রকম অসংযত ঘুঁসি মারবার ইচ্ছা হয়? দিনের পর দিন সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনে তিনি কেমন যেন ক্লান্তি হয়ে আসছেন। অতীতের সে তেজ, দীপ্তি আর নেই। কেন নেই? কি জন্যে তিনি প্রায়ই এরকম শারীরিক অসংবরণীয় উত্তেজনা পান? যৌবনে প্রত্যেকটি পদক্ষেপে গাম্ভীর্য আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ঔদাসীন্যে নিজের এক অপূর্ব ব্যক্তিত্ব রচনা করেছিলেন। যশ, ঐশ্বর্য সমস্ত তিনি পেয়েছেন। অযাচিত। অজস্র। কিন্তু এজন্যে কী তাঁকে কম বাধা পেতে হয়েছে! বড়লোক হয়ে জন্মালে বড় হওয়া যায় না, নিজে ভাগ্যবান হতে হয়। ভাগ্যের অনুগ্রহে শরীর আর মনের পরিশ্রমে তিনি বড় হয়েছেন। তবু আজ তাঁর এই বিপুল ঐশ্বর্য ভোগ করবার কেউ নেই, দূর আত্মীয় আর অনাত্মীয়ের মধ্যে তাঁর সমস্ত কীর্তি ভাগাভাগি হয়ে ধ্বংস হবে। হরিনাথ অপুত্রক। এতবড় বাড়ীটার মধ্যে অগণিত স্ত্রী পুরুষ, অথচ কারো সাথেই তাঁর মনের কোন সংস্পর্শ নেই। শুধু ঠাকুর চাকর আর দূর আত্মীয়ের কলরবে বাড়ীটা উজ্জ্বল। এদের নিয়েই তাঁর বৃহৎ সংসার।

প্রায় বছর দশেক আগে সুলতা আত্মহত্যা করে এ সংসার থেকে মুক্তি পেয়েছে। সেটাই হরিনাথের জীবনে সব চেয়ে রূঢ় আঘাত। যৌবনে তাঁর প্রকৃতি গম্ভীর ছিল; কিন্তু তারপর থেকে তিনি সকলের নাগালের বাইরে আশ্চর্য দুর্লভ হয়ে উঠলেন। মনে মনে স্বীকার করলেন এই খ্যাতি আর বিত্ত সমস্তই মূল্যহীন, মনের পরিধি সংকীর্ণ হয়ে এলো। এখন অসংখ্য শত্রুর হাত থেকে নিজেকে শুধু বাঁচাতে হবে। তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কতগুলো মানুষ নিঃশেষে সমস্ত শোষণ করে নেবে। হয়ত তাঁকে খুন করবে, হয়ত বিষ খাইয়ে মারবে! কতগুলো অপ্রয়োজনীয় ভবঘুরে জীবন, যারা দুমুঠো খাবার আর আশ্রয় না পেলে বাঁচতেই পারত না তারাই কী বিশ্বাসঘাতকতা করবে? আশ্চর্য নেই কিছু, ওরা সব পারে! আশেপাশে

ভয়ের ফাঁদ বিছিয়ে রেখেছে যেন। সন্দেহ আর হতাশার রোমন্থনে আস্তে আস্তে তিনি বার্ধক্যে এসে ঠেকেছেন। তাই আজ নিজেকে বড় বেশী পরিশ্রান্ত মনে হয়। সংসার-চক্রের সমস্ত নেশা আর উৎসাহের বাইরে কার্ণিশে-ঘেরা সংকীর্ণ ছাদের এই ফাঁকা বাতাসই এখন তাঁর নির্ভর আশ্রয়। ছাদে এলেই ঐ জমিটা তাঁর নজরে পড়ে, ওখানকার মানুষগুলোর সাথে হরিনাথের পরিচয় নেই, তবু প্রায়ই তিনি ছাদের কার্ণিশে ঝুঁকে ওদের জীবনযাত্রার গতি পর্যবেক্ষণ করেন। এদের চেনেন না কিন্তু চিনতে ইচ্ছে করে, বেশ রোমান্টিক লাগে!

হরিনাথের এই দেড় বিঘে জমির 'পর যে সব নিম্নমধ্যবিত্তদের বাস, তারা সংখ্যায় মারাত্মক রকম বেশী না হলেও যে বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিন কাটায় তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। অন্তত হরিনাথ কল্পনায়ও এদের অস্তিত্বের সঠিক সংজ্ঞা দিতে পারেন নি। ঘেঁসাঘেঁসি অনেকগুলো সংসার অদ্ভুত উপায়ে যুগের পর যুগ বাস করছে। সামান্য স্বার্থের জন্য এরা অন্যায়রকম গোলমাল করে; জীবনের বৃহত্তর প্রশ্নে অতিরিক্ত বিব্রত হয়ে কেমন যেন চ্যাপ্টা আর অসংগত হয়ে গেছে এদের মনের বিস্তৃতি।

একতলার স্যাঁতসেতে অন্ধকার ঘরগুলোর মধ্যে যথেষ্ট তৎপরতার সাথে যে যার সংকীর্ণ গণ্ডী সীমাবদ্ধ করে নিয়েছে। হরিনাথ সে সব জানেন না। জানবার দরকার হয় না। মাসে মাসে ভাড়ার টাকাটা ঠিকমত আদায় হলেই হ'ল। কে সূর্যের উদার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কে ঠিকমত দু'কলসী খাবার জল নিতে পারে না, কিম্বা প্রত্যহ সৌদামিনী কেন একটা কাল্পনিক সন্দেহকে সরলার উপর প্রয়োগ করে এসব তদন্ত করবার সময় তাঁর নেই। সত্যি কথা বলতে কি সেই জন্যেই তিনি ওদের তাড়িয়ে দিতে চান। কাজ নেই বাড়ী ভাড়ায়: এ জমিটা পড়ে থাকলে এমন কিছু তাঁর ক্ষতি হবে না। রোজ একটা না একটা অভিযোগ আসছেই। এতগুলো অসন্তুষ্ট জীবনকে কী করে তিনি খুশী করবেন? কী স্বার্থ আছে তাঁর এদের সুখী করবার দায়িত্ব নেওয়ায়?

এই একতলা অন্ধকার ঘরগুলোরও একটা ছাদ আছে। অবিশ্যি সে ছাদ হরিনাথের নিজের বাড়ীর ছাদ থেকে অনেক নিচে। সেখানে সবার সমান আধিপত্য। ছাদের কোন বিশেষ অংশ কারো নিজের সম্পত্তি হতে পারে না। সুতরাং সেখানে আর দ্বন্দ্ব নেই, সংগ্রাম নেই। ছাদে উঠতে হয় একটা ভাঙ্গা মই বেয়ে, খুব সাবধানে, সন্তর্পণে। যে কোন সময়ে মানুষের স্পর্শিত চাপে এটা ভেঙ্গে পড়তে পারে। তাই এ বাড়ীর প্রত্যেকটা মানুষ আর যাই হোক ছাদে ওঠবার সময় খুব হিসেবী হয়। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার শেষে সন্ধ্যায় ওরা সবাই এখানে আসে। তখন আরম্ভ হয় গুঞ্জরণ, সমস্ত দিনের ঘর্মাক্ত শরীরে ওরা উত্তেজনা পায়।

চারতলার ছাদে পায়চারী করতে করতে অসুস্থ মন নিয়ে হরিনাথ ভীষণ ক্ষেপে যান। ভাবেন: কী দরকার ওদের ছাদে ওঠবার, মইটা ভেঙ্গে দেবো নাকি? না ওদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবো?

এদিকে একতলার ছাদে হটাৎ সৌদামিনীকে নিয়ে সাংঘাতিক গোলমাল বেধে যায়। সৌদামিনী একা। বিপক্ষে সবাই। তার বার বছরের ছেলেটা পর্যন্ত। এ বাড়ীর পুরুষগুলো কেউ কারখানায় কাজ করে, কেউ বা ছাপাখানার কম্পোজিটর, যদিও বেকারের সংখ্যাই বেশী—তারাও সারা দুপুর সহরের উত্তপ্ত পথে জীবনের ব্যাখ্যা খুঁজতে খুঁজতে আগুন হয়ে বাড়ী ফেরে, সুতরাং অন্ধকারে ধূম্রমিশ্রিত বায়ু সকলেরই কাম্য। নিঃশব্দে সবাই ইতস্তত: শুয়ে পড়েছে। সৌদামিনীর ঘুঁটে চুরি যাবার অভিযোগ শোনবার ধৈর্য কারো নেই।

সৌদামিনী কিন্তু তবু থামতে চায় না, অনর্গল মাথা ঝাঁকিয়ে বকতে থাকে: কি জানি বাছা তোমরা আজকাল আর আমারে সহ্য করতি পার না, বলি আমি ত আর বড়নোক নই যে নিত্যি ছ'সাতখান করে ঘুঁটে চুরি যাবে তবু আমি মুখ ফুটে দুটো কথা বলতি পারব না।

নিবারণ বাধা দেয়: তুমি থাম ত, ও রকম প্যানপ্যান কোরনা এখন, যদি ঝগড়া করবারই মন থাকে ত নিচে যাও বাপু।

'কেন গো করব না শুনি, ছাদ কী তোমার একলার নাকি,' সৌদামিনী চোক গিলে নেয়, 'আমি গরীব মানুষ, অভাব নেগেই আছে……'

নরহরি প্রতিধ্বনি করে, 'নিশ্চয়, ঠিকই ত।'

এতক্ষণ নরহরি ছাদের এক সংক্ষিপ্ত কোণে বসে তামাক টানছিল। এবার এগিয়ে এলো সৌদামিনীর কাছে। প্রকাশ্যে এবং নেপথ্যে সৌদামিনীর 'পর নরহরির আত্মীয়তাহীন মমতা একটু উগ্র রকম বেশী। ব্যাপারটা সকলেই জানে, তাই আর কেউ আলোচনা করে না। মনস্তাত্ত্বিক কোন জটিল কারণে নরহরি ওর স্থূল দেহের খুব কাছাকাছি বসে গল্প করতে ভালবাসে কিনা বলতে পারি না, তবে মাঝে মাঝে যখন সৌদামিনী হতভাগা নরহরি সম্বন্ধে অতিরিক্ত উৎসাহী হয়ে ওঠে, তখনই হয় নরহরির মুশকিল। কী করে সে সৌদামিনীকে বোঝাবে এত শুশ্রূষা, তদ্বির তার দরকার নেই: ওর মনের মালিক ত সে বহুদিনই হয়েছে কতগুলো নির্লিপ্ততার আশ্চর্য প্রমাণ সংগ্রহ করে, কিন্তু ওর সঞ্চিত পুঁজির সন্ধান আজও পাওয়া গেল না। টাকাকড়ির ব্যাপারে সৌদামিনী তার কাছে দুর্বোধ্যরকম ব্যবধানে। আজ পর্যন্ত নরহরি নাগাল পেল না। তবু ভরসা রাখতে হয়। সুযোগ কী আর হাজার বার আসে, আসে একবারই এবং সেই জন্যেই ত নরহরি যুদ্ধরত সৈনিকের মত বোমা বিমান নিয়ে প্রস্তুত। কাজ হাসিল হ'লে কর্পূরের মত সে এবাড়ী থেকে উবে যাবে।

এটাই হ'ল তার মনের কথা, কিন্তু আজো কোন অতর্কিত মুহূর্তেও কিছু বেফাঁস হয়ে যায়নি। তবু কেন যেন সৌদামিনী সব সময়ই সতর্ক থাকে। এটা ঠিক নরহরিকে তার খুব ভাল লাগে, কিন্তু নরহরি যখন নিজের মুখে ওর দেহের নিকট-উষ্ণতা কামনা করে তখনই ও লজ্জায়, বিস্ময়ে আবোলতাবোল বকতে বকতে একেবারে নিস্পন্দ হয়ে যায়। নরহরিরও তাই ব্রহ্মাস্ত্র এটি। সময়ে অসময়ে সৌদামিনীর চল্লিশের কোঠাকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া শরীরটাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া করে। শিথিল দেহ নিয়েও নরহরিকে জয় করতে পারার সার্থকতায় সৌদামিনী

মনেপ্রাণে শিহরণ পায়। তাই মৌখিক আপত্তিটুকু জানাবার কথাও মনে থাকে না। অনেক পরে চ্যাচামেচি আরম্ভ করে দেয়, তখন নরহরি ক্ষুধিত দৃষ্টিতে ওর আঁচলের চাবির দিকে চেয়ে থাকে।

'কিগো তুমি আবার এখন বিরক্ত কর ক্যানো, সর ছাই আমার মাথার ঠিক নেই; সৌদামিনীর রাগ বুঝি এখনও পড়েনি।

নরহরি মুখে গদগদ ভাব নিয়ে নিতান্ত অশ্লীলভাবে ওকে আকর্ষণ করে, 'কি আশ্চয্যি ক'খানা ঘুঁটে চুরি গেছে ত অত চ্যাচাও ক্যানো, তোমার আবার টাকার অভাব নাকি? এখন ওসব বাদ দাও, ইদিকে সরে এসো দুটো গপ্পসপ্প করি।'

'আহা, সরো, আর ঢংএ কাজ নেই বাপু', সৌদামিনী দেহে রোমাঞ্চ অনুভব করে।

'ক্যানো, আমি তোমার পিঠে ত একটু হাত রাখলুম, আর চাবিটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেছি তাতেই...?'

নরহরির খুব কাছে এসে সৌদামিনী বলে, 'আমার শরীলে হাত দিলে ব্যথা নাগে আর চাবিতে হাত দিলে ভয় হয়, তুমি চাবি ছাড়, শিগগির কচ্ছি।'

সমস্ত আয়োজন এরকম করুণ ভাবে ব্যর্থ হ'ল। নরহরি নিভে-যাওয়া হুঁকোতে কয়েকবার আপ্রাণ টান দেয়।

নিচে চাপা গোলমাল শোনা যায়। সরলার ছেলেপিলেগুলোই খুব সম্ভব ক্ষেপে উঠেছে। সৌদামিনী সমবেদনা জানায়: 'আহা, সরলার আজ খুব জ্বর হইছিল, অথন আবার ওদের উৎপাত, পরমেশ্বর ওরে কী কষ্টই যে দেছেন: আমি বাবা খাসা আছি, ঝাড়া হাত পা, পোলাটারে অখুন তেনার আশিব্যাদে মানুষ করতি পারলিই হয়।'

এতক্ষণে নিবারণ যোগ দেয়, 'সরলার ছোট ছেলেটার গায়ে সেই ফুস্কুড়িগুলো এখন থ্যাকবেকে ঘা হয়ে গ্যাছে, কোত্থা থেকে যে ছিষ্টিছাড়া রোগ জুটল।'

নরহরি বলে, 'হুঁ, ওসব বড্ড ছোঁয়াচে রোগ, বলি তোমাদের সাবধানে থাকতে তা ত শুনবে না। সৌদামিনী ত দিনরাতই ওটাকে টানছে; আরে বাবা, নিজের শরীলে যখন ও-রোগ ঢুকবে তখন কে দেখবে শুনি, কে সেবা করবে হ্যাঁ?'

'কেন গো আমার ত তুমিই আছ,' সৌদামিনীর কোটরাগত চোখে বিদ্যুৎ জ্বলে।

'হা কপাল, তুমি বলে একটু পিঠেই হাত রাখতে দাও না তা আবার ইয়ে...'

নিবারণ নিচে নামতে নামতে সরলার বড় ছেলেকে সামনে দেখে জিজ্ঞাসা করে, 'কিরে তোর মা কেমন আছে?'

'জানি না।'

'আজ যে তোরা ছাদে আসিস নি?'

ছেলেটা কোন কথা বলে না। অন্যমনস্কভাবে গলিতে নেমে পড়ে। আজ সন্ধ্যায় সরলাই শুধু ছাদে আসেনি। সারাটা দুপুর সে জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে ছিল, এখন বুঝি গা

একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। ছেলেগুলো খাবারের জন্যে সমস্ত দুপুর হিংস্র চীৎকার করেছে, অস্থির মনে হয়ত অভিশাপ দিয়েছে। কিন্তু সরলার কানে ওদের বিষাদমুখর কোলাহল পৌছায় নি। ভালই হয়েছে। অন্তত কয়েক ঘণ্টাও ত সে ওদের অনিবার্য দাবীর হাত থেকে ছুটী পেয়েছিল!

সে সময়টা শশধরের মধ্যে কিন্তু অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছিলো। সাদা দৃষ্টিতে সরলার মাথার সামনে বসে রোরুদ্যমান ছেলেগুলোর দিকে মাঝে মাঝে সে তাকিয়েছে, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে জানলায় এক টুকরো নীল আকাশে। ওদের সামান্য তাড়া পর্যন্ত সে দেয়নি। হয়ত শশধর ভেবেছিল এখন এত গোলমালের ভিতর নিজের প্রাধান্য দৃঢ় রাখা অসম্ভব হবে। তার রক্তে যাদের জন্ম তাদের সে ভালভাবেই চেনে। শশধর দেখেছে দারিদ্র্যের কুৎসিত চাপে শিশু অবস্থায় তার মধ্যে যে বিদ্রোহ আসত তার চেয়ে এদের অসহিষ্ণু মন আরো বেশী কঠিন। ছয়টি ছেলেমেয়েকে সে নির্ভুল বিশ্লেষণ করেছে। আজ মেজাজ তার রুক্ষ। পৃথিবী তার কাছে অর্থহীন। সরলা তার কাছে অপ্রয়োজনীয়। সরলার দেহের রহস্য আর মনের প্রেম তার মধ্যেও একদিন বিসর্পিত আবেগ এনেছিল, ছয়টি শিশুর জীবন্ত কঙ্কালই বুঝি তার সংকেত।

ছোট ছেলেটার আকস্মিক চীৎকারে শশধরের চেতনা ফিরে আসে। মন্থর পায়ে এগিয়ে এসে ওকে কোলে তুলে নেয়, 'কি হ'ল, ঘা টন্‌টন্‌ করছে বুঝি, না যাট...আ-আ...'

সরলা রান্নাঘরে নিজেদের একটু বার্লি জ্বাল দেবার জন্যে বসেছে। শরীরে সুস্থতা নেই মোটে, সমস্ত গায়ে অসহ্য ব্যথা আর বুকের ধড়ফড়ানি ত আছেই। ওর পাশে একটা ছেলে শুয়ে ক্রমাগত হাত পা ছুড়ছে। মুখে সেই এক কথা, 'খেতে দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে, মরে গেলুম মা...'

এদের প্রাত্যহিক দাবীর অভিশাপেই সরলা দিনের পর দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। আগে সে ওদের কত বুঝিয়েছে, কিছুতেই বিরক্ত হয়নি। আজকাল তার মধ্যে স্পষ্ট ক্লান্তি এসেছে। কিছুতেই সে বিচলিত হয় না, কথা বলে না সহজে। বার্লিটুকু ধরে যেতে পারে, সরলা একমনে খুন্তি দিয়ে নাড়ছিল, সহসা পিছন থেকে আর একটা ক্ষুধিত উলঙ্গ শিশু ছুটে এসে ওকে বিশ্রীভাবে ধাক্কা দেয়, 'খেতে দিবি না, খিদেয় যে আমরা মরে যাচ্ছি, চালাকি পেয়েছিস, কাঁদরে খোকা, জোরসে চ্যাচা—'

তবু সরলার মধ্যে কোন উত্তেজনা আসে না, খুব শান্ত গলায় বলে, 'আবার ও রকম তুই করে কথা বলা, জানোয়ার কোথাকার? যার তার সংগে মিশে একেবারে চাষা হয়ে গেছিস, এই মাত্তোর ত এক গ্লাস বার্লি খেলি।'

'ছাই খেলাম, ও ত শুধু গরম জল, আমি কিছু বুঝি না নাকি,' ছেলেটা কেঁদে ফেলে।

'ঐ খেয়ে রাত্তির কাটাতে হবে, সাতজন্ম দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে আছিস নাকি? বেশী প্যানপ্যান করিস ত বাবুকে ডাকব কিন্তু।'

'বারে! সকালে তুমি বলেছিলে একটা পয়সা দেবে, শিগগির দাও, নইলে বার্লির কড়া লাথি মেরে ফেলে দেবো।'

'দে না দেখি হাড়হাবাতে, অত বিশ্বব্রেম্যাণ্ডের খিদে নিয়েই যদি এসেছিলি ত হা-ঘরে জন্মালি কেন!'

'বেশ করেছি,' শিশুটি নির্বোধ দৃষ্টিতে ভয়ংকর হয়ে উঠে। দেখতে দেখতে বাকি ছেলে-মেয়েগুলোও সরলাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে, বড় ছেলে মণ্টুও একটা এনামেল বাটি নিয়ে সামনে বসে। সরলা একে একে সকলের দিকে তাকায়: সেই ফ্যাকাসে চাউনি, সেই দুর্বোধ আকাংখা! বার্লিটুকু সে সকলের মধ্যে ভাগ করে দেয়। ওরা এক নিঃশ্বাসে সব শেষ করে গভীর আগ্রহে বাটি চাটতে আরম্ভ করে।

মলিনা এতক্ষণ সকলের পিছনে ছিল, এবার সবাইকে ঠেলে সামনে বাটিটা এগিয়ে ধরল, 'মা আমাকে এইটুকু দিলে, আমি ত সারাদিন কিছুই খাইনি!'

এই মেয়েটার 'পর সরলার শুকনো মনেও একটু মমতা আছে। বেচারী ওর মতই সারা দিন চুপচাপ এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, কোন সময় মুখ ফুটে কিছু চায়ও না, আর ঐ ছেলে-গুলো প্রত্যেকটা পশু, শশধরের মত পাষণ্ড! কিন্তু আজ মলিনাকেও তার ভাল লাগল না: কী নির্লজ্জের মত হ্যাংলাপনা, এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই ধাড়ী মেয়েটার! শশধরের মেয়ে ত, আর কতই বা আশা করা যাবে। সরলার রাগের মাত্রা তখুনি হটাৎ বেড়ে যায়, দুর্বল স্নায়ুগুলো অস্বাভাবিক কাঁপে, মাথাটা ঘুরে ওঠবার সাথে সমস্ত দেহ শিথিল অবসাদে নুয়ে পড়ে।

খোকা চীৎকার করে ওঠে, 'ও বাবা শিগগির এসো, মরি হিস্টিরি হয়েছে, মা বোধ হয় মরে গ্যাছে!'

শশধরের বৈদ্যুতিক আবির্ভাবে ছেলেগুলো মরার মত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মনে হয় এই উলঙ্গ শিশুরাই বোধ হয় পৃথিবীর সব চেয়ে নিরীহ জীব। এদের জীবনে হয়ত কোন প্রতিবাদ, মর্মান্তিক আবেদন কিছুই নেই। এখন থেকেই ওরা শশধরকে দেখে আস্তে আস্তে ভাগ্যকে স্বীকার করে নিতে আরম্ভ করেছে মাত্র।

সরলার জ্ঞান ফেরাবার জন্যে বিশেষ কোন হাংগামার দরকার হয় না: চোখেমুখে কিছু জলের ছিটে দিলেই মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসে। তখন সরলা নিজের কাজে মন দেয়, শশধর বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। একটু আগেও যার বাহ্যিক জ্ঞান পর্যন্ত ছিল না, এর মধ্যেই সে নড়েচড়ে বেড়াবার প্রেরণা পায় কেমন করে?

'শুনছ, একটু শুয়ে থাকলে পারতে খানিকক্ষণ।'

সরলা নিক্ষিপ্ত বোমার মত ফেটে পড়ে, 'দশটা লোক আছে যেন আমাকে সাহায্য করতে।'

'ভালর জন্যেই বলছি, আমার কী?'

'দরকার নেই ভালতে, আমার একার জন্যে ত আর এতগুলোকে মরতে দিতে পারি না। তোমার আর কি বল না, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াও।'

'তার মানে, চাকরি পাচ্ছি না সেটা কী আমার দোষ?'

'চেষ্টা করতেও ত দোষ নেই, আজ দুপুরে ঘরে বসে না থেকে একটু খোঁজাখুঁজি করলেই ত হ'ত।'

'তোমার যা জ্বর এসেছিল, কি করে যাই বলো?'

'ত্যাখো, আমার জন্যে যদি অতই ভাবতে বসো, তাহলে ছেলেমেয়ের একটাকেও বাঁচাতে পারবে না বলছি।'

'আজ ছাদে গেলে না', শশধর প্রসঙ্গ উল্টে নেয়।

'না, ওরা ছোট খোকাকে দেখলে ভয় পায়, ওটাও ত সব সময় চ্যাচায়, ওরা বিরক্ত হয়।'

'তা হোক, খোকাকে দেখলে ভয় পায় মানে? ও কি মানুষ নয়? ছাদ কারো একলার নয়, যাও ওদের নিয়ে একটু ঘুরে এসো, এখানে বড্ড গরম।'

'মা ছাদে যাবো যে, কত রাত্তির হয়ে গ্যালো,' মণ্টু আবদার ধরে।

'কি আশ্চয্যি রে বাবা, একটা না একটা বায়না তোদের লেগেই আছে। যাবি ত যা না বাপু, অত চীৎকার কিসের?'

'তুমিও চল।'

'আমার গেলেই হ'ল, তারপর তোমাদের হাজারবার গেলবার ব্যবস্থা কে করবে শুনি?'

'ইস, একবারই খেতে দ্যায় না, তা আবার লম্বা চওড়া কথা,' কোথা থেকে আর একটা শিশু আর্তনাদ করে ওঠে।

'তুমি না গেলে আমরা যাব না মা,' মলিনা এসে উনানের পাশে দাঁড়ায়।

'থাক তবে, তোদের গিয়ে কাজ নেই।'

'তোমাকে যেতেই হবে, নইলে এক চড়ে সাবাড় করে দেবো,' শিশুটি হিংস্র আক্রোশে ওর দিকে তেড়ে আসে।

'এ রাবণের চিতের জলবার চেয়ে মরলে ত শান্তিই পেতাম রে পোড়ারমুখো!'

প্রেতের মত শশধরের মন্থর আক্রমণে শিশুটা হকচকিয়ে যায়। শশধর রুগ্ন হাত দুটো ওর গলার কাছে এনে সজোরে চেপে ধরে! এই ত সে দিন নিজের দশ দিনের একটা নিষ্কলংক সন্তানকে এমনি মৃদু চাপ দিয়ে সে কতখানি দায়িত্বের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল! কে জানে সে কথা, কেই বা বিশ্বাস করবে বল? আজও তেমনি কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই আর একটা বৃহত্তর প্রশ্নের সমাধান করা যায় না কি? হাতের চাপে গলায় নীল দাগ বসে যায়: সরলার আবার ফিট হয়, ছেলেটা চীৎকার করে ওঠে, কিন্তু মরে না।

উপরের একতলা ভাঙ্গা ছাদে সে শব্দ কেউ শুনতে পায় না। শুনতে পান হরিনাথ তাঁর চারতলার ছাদ থেকে। এতক্ষণ আস্তে আস্তে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে আর তিনিও সমস্ত কাজ ফেলে সেই যে এখানে এসেছিলেন আর নিচে নামেন নি। কতগুলো অসংলগ্ন চিন্তায় একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। তবু অসহায় বালকের তীক্ষ্ণ চীৎকার তিনি শুনতে

পান, খুব অস্পষ্ট, অথচ সাংঘাতিক! মনটাও তাঁর অসুস্থ হয়ে ওঠে: আচ্ছা, ওদের মধ্যে এত বিশৃঙ্খলা কিসের জন্যে? কিছুই যেন তিনি বুঝতে পারছেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ওরাও কোন অবিশ্বাস্য কৃত্রিমতা সৃষ্টি করে নাকি? সুলতার মত ওদেরও কেউ স্বামীর অসামর্থ্যকে বর্বর চোখে উপেক্ষা করে? হরিনাথ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন: দেয়ালে কয়েকটা ঘুঁসি মারবেন নাকি আবার!

'একবার নিচে আসবেন কি স্যর', পিছনে অস্পষ্ট ছায়া কথা বলে।

'কে, সমীর? কী চাও?'

'আজ্ঞে অবনীবাবু এসেছেন, মিলের অবস্থা নাকি খারাপ।'

'কি বিপদেই যে পড়েছি সমীর, উঃ, সব গেল হে, সব গেল, আমার.....'

'আপনিও ভেঙ্গে পড়লেন স্যর!'

'হুঁ, তুমি অবাক হয়েছ না? সত্যি আজকাল আমি যেন কেমন হয়ে গেছি, তাই না? কি জান সমীর, কিছুই যেন আমার ভাল লাগতে চায় না এখন, তাই সময় পেলেই ছাদে এসে চুপচাপ বসে থাকি, বাড়ীর মানুষগুলোর কিন্তু খুব সুবিধে হয়েছে যাই বলো, আমিই ওদের কাছ থেকে যেন সব সময় ভয়ে আলাদা থাকি।'

সমীর বিনীতভাবে হাত কচলাতে কচলাতে আর একটা সংবাদ জানায়, 'আজকে ওই বস্তির নিবারণ ব্যাটা আবার এসেছিল স্যর।'

হরিনাথ গাম্ভীর্য আর আশংকার মধ্যে দুর্বোধ্য হাসেন, 'কি জান সমীর, গরীব জাতটাই আসলে নোংরা, দোষ ওদের না হতে পারে কিন্তু তার আমি কি করব বল! পৃথিবীর সমস্ত হতভাগাদের জন্যে আমি যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দেবো নাকি! এবার এলে ব্যাটাকে স্রেফ জুতো মেরে তাড়াবে, ওই একমাত্র ওষুধ মনে রেখো, হে হে.....'

সমীর কৃতজ্ঞতায় মাটিতে মিশে যেতে চায়।

'এক কাজ করতে পার সমীর, অবনীকে বরং এখানেই ডেকে আনো।'

বন্ধুর সাথে হরিনাথ কিছুক্ষণ বৈষয়িক গুরুতর আলোচনা করেন। তাঁর মুখের প্রতিটি রেখা দুর্লভ ব্যক্তিত্বের ছাপে প্রখর হয়ে ওঠে। এখন আর তিনি কল্পনাবিলাসী সাধারণ মানুষ নন, কয়েক হাজার মূর্খ অনশনক্লিষ্ট দেশবাসীর ঈশ্বর! বিধাতার দায়িত্বের আংশিক গুরুভার তাঁর মাথায়।

অবনীনাথ বিদায় নেবার পরই হরিনাথের মধ্যে কেমন যেন একটু উৎকেন্দ্রিক ভাব দেখা যায়। সমস্ত মুখ তাঁর রক্তহীন হয়ে গেছে। এতবড় একটা দুঃসংবাদ এখনও তিনি মেনে নিতে পারছেন না; অবনীর কাছে খবর পেলেন তাঁর শ্রীরামপুরের কারখানায় শ্রমিকরা রীতিমত ধর্মঘট আরম্ভ করেছে। শুধু কি তাই, ওরা নাকি আবার শাসিয়েছে, শিগগির মিটমাট না করলে সমস্ত কারখানা আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে। কী স্পর্ধা এই ভবঘুরে কুকুরগুলোর! কিন্তু উপায় নেই, এই যুদ্ধের বাজারে এক মুহূর্তও ত আর কারখানা বন্ধ রাখা চলে না, তাই ওদের অন্যায় দাবী সাময়িকভাবে মেনে নিতেই তিনি অবনীনাথকে উপদেশ দিলেন। আজ তিনি অপারগ হয়েছেন, সেই জন্যে সমস্ত কারখানার ভার অবনীনাথের ওপর, তিনি নিজে যদি জাখাগুলো করতে পারতেন, তাহলে কী আর ওরা এতটা সুবিধে পেত! বিপদ সকলেরই আছে অথচ বড়লোকের বিপদগুলো কী মর্মান্তিক!

উত্তেজনায় হরিনাথের বাতে পঙ্গু পা দুটো কাঁপতে কাঁপতে অবশ হয়ে আসে। মেঝেতেই বসে পড়েন। সত্যি কী তাঁর জীবনে নতুন কোন সূচনা দেখা দিয়েছে। ঐশ্বর্য আর সম্মানের এমন সংকট অবস্থা ত কোনদিনই তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। বিকারগ্রস্ত মনের 'পর এই আকস্মিকতা ক্রমেই তাঁকে ঝিমিয়ে আনে। সমস্ত বিদ্রোহের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার ইচ্ছা আর শক্তি তাঁর লোপ পেয়েছে। ছাদের কার্ণিশে ঘেরা এই সংকীর্ণ জায়গাটুকু তাঁকে আশ্বাস দিতে পারছে কই? এখানকার বাতাসও বুঝি ভারি হয়ে উঠেছে। হরিনাথ উন্মাদের মত আবোল-তাবোল বকতে বকতে আর একবার ওঠবার চেষ্টা করেন। এক পা এগুতে না এগুতেই পড়ে যান, দুর্বল স্নায়ুগুলো সাথে সাথে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

যে মুহূর্তে ধনী হরিনাথ তাঁর জীবনের প্রান্তিক অবস্থাকে সহ্য করতে না পেরে অন্ধকারে ছাদের মেঝেতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁকে উদ্দেশ্য করে আর একজন সামর্থহীন মানুষ যে অশ্লীলভাবে কাদা ছিটাচ্ছিল, তা তিনি জানতে পারলেন না। অন্ধকার একতলার ভাঙ্গা ছাদে নিবারণ বেশ সবাইকে জমিয়ে তুলেচে। হরিনাথের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বক্রোক্তি তারই।

'বুঝেছ হে জগবন্ধু, শালার বাবু একেবারে চামার, খেতে না পেয়ে সংসার নিয়ে মরতে বসেছি এতদিন ঘোরাঘুরি করলাম, কারখানায় একটা কাজ জুটিয়ে দিলে না।'

জগবন্ধু দেশলাই না থাকায় হাতের বিড়িটা কানে গুঁজে নেয়, 'হুঁ ব্যাটা যেন সিংহাসনে বসে ইয়ে করছেন, দেবো একদিন সাবাড় করে—'

'সিংহাসনটাই সাবাড় করে দাও বরং।'

নরহরি হঠাৎ ছাদের সেই সংক্ষিপ্ত কোণ থেকে চীৎকার করে ওঠে, 'কী বিপদ, আবার সরলা তুমি ছেলেটিকে এখানে আনলে? ইস, জাখো দিকি ঘা কি রকম খ্যাকব্যাক করছে, কি মাছি, বাপরে বাপ্..... শিগ্‌গির ওকে নিয়ে যাও, ছোঁয়াচে রোগ, আমাদের মারবে নাকি?'

সৌদামিনী দুহাত বাড়িয়ে দেয়, 'দাও ত সরলা আমার কোলে, কেঁদে কেঁদে বাছার মুখ কী রকম ফুলে গ্যাছে গো··· আহা, যাট—'

নরহরি আঁতকে ওঠে, 'আরে ও তুমি করছ কী, ছোঁয়াচে রোগ যে, কি বিপদ!'

নিবারণ বাধা দেয়, 'ওটা ছোঁয়াচে নাও হতে পারে, মিছেমিছি হুজুগে মানুষের মত চ্যাচামেচি করো ক্যানো?'

নরহরি ফ্যালফ্যাল করে নিবারণের দিকে তাকিয়ে থাকে। জগবন্ধু এদের যুক্তি আর তর্ক, ভয় আর সন্দেহের ঊর্দ্ধে বিচরণ করবার জন্যে কানের বিড়িটা নিয়ে ঠোঁট দুটোর মধ্যে আলগা ভাবে চেপে ধরে, তারপর সস্তা মদের নেশায় বিভোর তিনকড়িকে ধাক্কা-ধাক্কি আরম্ভ করে একটা দেশলাই কাঠির জন্যে। আজ প্রেস থেকে তিনকড়ি তার মাইনের সিকিভাগ পেয়েছে, মদ খাবে না?

সরলা এতক্ষণ নরহরির হীন আক্রমণে কোন কথাই বলেনি। কোনদিনই সে বিশেষ কিছু বলে না। বলবার কী-ই বা আছে তার! ছেলেটা জন্মাবধি এমনি অদ্ভুত দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, কান্না তার কোন সময়েই থামতে চায় না, কোন সময়ে চীৎকারের সাথে হাত পা ছুড়তে ছুড়তে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এতকুটু ছেলে, কিছুই ত সে স্পষ্ট করে বলতে পারে না, সরলা কী করে বুঝবে ওর ভিতরের গোলমাল! কিন্তু আজ নিবারণের সমর্থন পেয়ে সরলা প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠল।

'কী বলছ তোমরা, ছেলেটার গায়ে ছোঁয়াচে রোগ, কক্ষোনো না, হতেই পারে না: তোমাদের চোখে ছানি পড়েছে তাই ওরকম ভাবো। তোমরা ত বাপু বাড়ীতে এতগুলো মানুষ, আর এই যে আমার ছেলেটা দিনরাত ট্যাঁ ট্যাঁ করে চ্যাঁচায়, কেউ কী কোন সময় একটু খোঁজ নিয়েছ? তোমরা সব সময়ই বড্ড ব্যস্ত থাক দেখি, কী এত কাজ বাপু তোমাদের?'

এতগুলো কথা গুছিয়ে বলতে পারায় সরলার চেয়ে তার শ্রোতারাই বেশী বিস্মিত হোল। অবসাদে সরলার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল, হয়ত এখুনি মূর্ছা যাবে। ওদিকে সৌদামিনী নরহরির সমস্ত সতর্কতাকে উপেক্ষা করে ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরেছে।..... এদের আকস্মিক নিশ্চুপতা ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

'রাস্তায় নিশান ঘাড়ে করে হৈ চৈ করতে করতে কারা আসছে? এ-ত লোক? কী বলছে ওরা, এ্যাঁ'—জগবন্ধু সবাইকে সচেতন করে।

তাই ত। অনেক, অনেক লোক যে! কী বলছে ওরা? আগের চীৎকারগুলো গোলমালে শোনা গেল না।

'দুনিয়ার মজদুর এক হও!'.....'পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক্'.....'ইনক্লাব—'

কী ব্যাপার? হরিনাথ ছুটতে ছুটতে কার্নিসের কাছে আসেন। ওঃ, যত সব ক্ষ্যাপা কুকুরের দল! বেকার কিনা, জানে জেলে খাবারের অভাব হবে না। কী চায় এরা? দেশ স্বাধীন করতে চায়? সব মাথা সমান করে দিতে চায়?—হরিনাথ বিহ্বল দৃষ্টিতে অন্তহীন বিশাল জনসমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকেন।

রাস্তার গ্যাস পোষ্টে অস্পষ্ট রক্তাভ আলো ঝোলে। সে আলোয় তিনি ওদের স্পষ্ট দেখতে পান। ওদের তীব্র দৃষ্টিতে বর্ষিত আগুন বুঝি তাঁর সুবৃহৎ প্রাসাদকেই পুড়িয়ে দেবে। নিরুপায় হয়ে হরিনাথ ওদের গায়ে থুথু ফেলেন। কাশতে কাশতে গলা থেকে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে আসে।

দোজবরে

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ভালবেসেছি শুধু একবার,
সেই আমার প্রথমাকে।
তারপরও যে না বেসেছি তা' নয়।
কিন্তু সে কেবল ধ্বনির পরে প্রতিধ্বনি,
যেন আদি কবির কাব্যের অনুকৃতি
উত্তর কবির অপটু রচনায়।
মিথ্যা কথা বলে লাভ কি?
নিজে যা করিনা বিশ্বাস,
তোমাকে তা গলাধঃকরণ করতে বলব কেন?
তুমি আর পাঁচটা প্রতিমার মত
তার একটি প্রতীক্ মাত্র।
চোখে দেখি তোমাকে,
ধ্যান দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে যাও তার মূর্তিতে।

আমার বর্ণ-পরিচয় হোল তার কাছে।
অনেক নূতন কথা গেঁথেছি তারপরে।
কিন্তু সেগুলো ভাঙলেই দেখি,
সেই আদিম বর্ণমালা!
সে যে আমার বসন্ত প্রভাতের প্রথম ফুল।
তারপর অনেক ফুলে মালা গেঁথেছি, তোড়া বেঁধেছি,
কিন্তু সে ছিল আমার প্রথম প্রত্যুষের ডালিটা ভ'রে।

দিনের আলোয় দেখি তোমার মুখ।
প্রদীপের আলোয় দেখি অচীন মুখে পুরাতনীর আভাস।
প্রদীপ যখন নেভে,
অমনি অস্পষ্ট স্মৃতি হয় উজ্জ্বল
ফুটে ওঠে তার সেই মুখখানি।

যখন অভাব অতৃপ্তি আকাঙ্খায় অধীর হই,
তখন স্মরণ করি তাকে,
যখন নিমগ্ন হই সুখে, বুকের মধ্যে কাঁদে রুদ্ধশ্বাস,
বাতাসে এসে হাঁফ্ ছাড়তে চাই,
যে বাতাসে ভাসে তার কেশ সৌরভ।

সে আমার পল্লী পুষ্করিণী,
সেই ছায়ায় ঢাকা তালপুকুর,
যার কালো জলে প্রথমে শিখেছি সাঁতার
ডুব্‌তে ভাস্‌তে
ছিপ্ ফেলে মাছ ধর্‌তে।
তারপর কত নদী সমুদ্রে দিয়েছি ঝাঁপ,
খেয়েছি হাবুডুবু
তবু ডুবিনি ভয় পাই নি।
এখন তোমার কূলে বেঁধেছি কুটীর,
নিত্য আবগাহন করি তোমার জলে,
রূঢ় স্নিগ্ধ, অনাবিল সুশীতল!
শান বাঁধানো রাণা
চারিদিকে প্রাচীর।
কেবল নেই সেই তালপুকুরের ছায়া,
কোকিল ঘুঘু মাছরাঙা গাঙ্‌শালিকের দল।
সেই ছায়া ঘনায় চোখে,
সেই পাখীর গান, পাখ্‌নার ধ্বনি
কেবল কানে জাগে,
চমকে উঠি।

বিরতি

নিখিল মৈত্র

সে-পৃথিবী আমার বেশ লাগে—
তুমি কী জানো,
তোমাকে আমাকে কেন্দ্র করে'
নিঃশব্দ পরিক্রমণ চলেছে
একটি নতুন পৃথিবীর!
তুমি কী অনুভব করো,
সে-পৃথিবীতে তুমি আমি দূরতম ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন!

তোমার আমার মধ্যে এই রহস্য-ধূসর দূরত্ব—
আমার বেশ লাগে।
নিষ্ঠুর-নির্জন সে-পৃথিবী আমার বেশ লাগে
মন যেখানে ক্ষণেক মুহূর্তের জন্য
জ্যৈষ্ঠের দুপুরের মতো মূর্ছিত, অসহায়—
সমস্ত কল্পনা
ধূ-ধূ প্রান্তরের নিঃসংগতায় নিষ্ক্রিয় উদাসীন!
বেশ লাগে,
সে মুহূর্ত আমার বেশ লাগে।

হয়তো সে-মুহূর্তে
তোমার হৃদয়ের গভীরতম অরণ্যে
একটি অলস আকাংখার একটানা কূজন,
আর আমার রক্তের নদী নিদ্রিত।
কে জানে,
রক্তের ঘুম ভেঙে যাবে কখন কোন্ দুরন্ত বন্যায়,—
আর আমার চোখ থেকে মুছে যাবে
এই মধুর পৃথিবী!

সহরতলী

—দ্বিতীয় খণ্ড—

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সকলে সিনেমায় গেল দল বাঁধিয়া। যশোদার বাড়ীতে যারা বাস করিতেছিল তারা তো গেলই, বাহির হইতে আসিয়া যোগ দিল কুমুদিনী আর কেদার।

যোগমায়া শেষ মুহূর্ত্তে হঠাৎ বাঁকিয়া বসিয়াছিল। সকলে তখন সাজগোজ করিয়াছে, কেদার আর কুমুদিনীও আসিয়া হাজির হইয়াছে। যশোদার সিনেমায় যাওয়ার উপযুক্ত বেশভূষা করা নিয়া একটু হাঙ্গামা বাধিয়াছিল—সেরকম কাপড় কই, ব্লাউজ কই? সুব্রতা যাচিয়া যশোদাকে কাপড় আর ব্লাউজ ধার দিতে গিয়াছিল, বলিয়াছিল, 'আমার এই কাপড়টা পরো না দিদি, আর এই ব্লাউজটা।'

অনেক দিনের পুরাণো তোরঙ্গ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে যশোদা বলিয়াছিল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তোমার জামা আমার হাতে ঢুকবে কিনা সন্দেহ, গায়ে দেব!'

'আচ্ছা, কাপড়টা পরো তা'হলে।'

'না দিদি, আমার যা আছে তাই ভাল।'

চওড়া পাড় পরিষ্কার একখানা সাদা শাড়ী পরিয়া যশোদা নিজেই একটু হাসিয়াছিল। 'রঙিন কাপড় পরার বয়েস কি আর আছে ভাই?'

জামাকাপড়ের এই আলোচনায় বোধ হয় যোগমায়ার খেয়াল হইয়াছিল, একে একে সে চাহিয়া দেখিয়াছিল সকলের দিকে। তারপর চাহিয়াছিল নিজের জমকাল শাড়ীখানার দিকে। এদের সঙ্গে সে সিনেমা দেখিতে যাইবে, এদের সঙ্গিনী হিসাবে? কি ভাবিবে লোকে? চেনা লোকে যদি তাকে এদের সঙ্গে দেখিতে পায়? এ পাড়াটা পার হইয়া যাওয়ার সময় তো অনেক চেনা লোকের চোখে পড়িয়া যাইবে, সত্যপ্রিয় চক্রবর্ত্তীর মেয়ে সে, কে না তাকে চেনে এপাড়ায়?

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া যোগমায়া কাপড় ছাড়িয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটু পরে রওনা হওয়ার সময়েও তাকে বাহির হইতে না দেখিয়া সুব্রতা ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, 'ও যাবে না দিদি। কাপড়চোপড় ছেড়ে বসে' আছে।'

তখন ব্যাপারটা বুঝিতে গিয়াছিল যশোদা।

মুখ ভার করিয়া যোগমায়া চৌকীতে বসিয়া আছে, বিনা দোষে কে যেন তাকে তিরস্কার করিয়াছে অনেক।

'কি হ'ল হঠাৎ, যাবে না কেন?'

'যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না যশোদা দিদি।'

যশোদা একটু হাসিয়াছিল, বলিয়াছিল, 'সেজেগুজে রওনা হওয়ার সময় হঠাৎ এরকম অনিচ্ছা হওয়া তো ভাল কথা নয়। চলো, লোকে কিছু ভাববে না। যদি ভাবে তো ভাববে যে, আমরা তোমার চাকরদাসী—তুমি কোথাকার রাজরাণীটাণী হবে, পাঁচ-সাতজন চাকরদাসী নিয়ে বায়োস্কোপ দেখতে এসেছো।'

যোগমায়া চোখও তোলে নাই, কথাও বলে নাই।

যশোদা গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, 'তার চেয়ে এক কাজ করনা? সাদাসিদে একখানা কাপড় প'রে চলো, এ কাপড়টা তোলা থাক। আমাদের সঙ্গে একেবারে মিশে যাবে—মনের খুঁতখুঁতানিটা যদি চাপতে পার কোনরকমে, কি ফুর্ত্তিটা হবে বল তো?'

পাশে বসিয়া যোগমায়াকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, 'নতুন কিছু একটা করেই ছাখোনা আমার কথায়—খেলা মনে করে' কর? সখ করে' কর?'

সাদাসিদে একখানা শাড়ী পরিয়াই শেষে যোগমায়া দলে ভিড়িয়াছিল। সকলেই হাসিখুসী, অল্পবিস্তর উত্তেজিত—উত্তেজনা ছাড়া তো আনন্দ হয় না। কেবল যোগমায়ার উত্তেজনার মধ্যে আনন্দ নাই, যশোদার হুকুমে সকলের সঙ্গে আসিয়াছে কিন্তু মন কেন খুসী হওয়ার হুকুম মানিবে? টিকিট আগেই করা ছিল, সকলে ভিতরে গিয়া বসিল। আরম্ভ হইতে তখনও আধঘণ্টার উপরে দেরী। তবে তাতে কিছু আসে যায় না। অজিত আর যামিনী ছাড়া, যারা নিয়মিত সিনেমা জ্বাগে, এ আধঘণ্টা সকলের কাছেই উপভোগ্য, যে আনন্দ কেনা হইয়াছে তার ফাউ। একেবারে অপরিচিত না হোক এই আলো-ঝলমল গুঞ্জনধ্বনি-মুখরিত ঘনীভূত আধুনিকতার জগতে সময় কাটানোর অভ্যাস যশোদার নাই। সকলের আগে যশোদার মনে হয় চারিদিকের দেয়াল আর ছাদগুলি যেন শিশুকে ভুলানোর জন্য মুখে রঙ-মাখা সুন্দরী মেয়ের মত অসহ্য কৌতুকের উদ্ভট মুখভঙ্গি করিয়া আছে। ঘরের দেয়ালে, আনাচে কানাচে সর্ব্বত্র হাতকর অনিয়ম। কোণগুলি কোণ নয়, রেখাগুলি সাপের মত আঁকা বাঁকা, এখানে ওখানে দু'চার হাত সমতল স্থান যদি বা থাকিয়া গিয়াছে রঙের কায়দায় সেখানটাও দেখাইতেছে উঁচুনীচু। কেমন পছন্দ মানুষের কে জানে, এমন খাপছাড়া ভঙ্গিতে ঘর তৈরী করে আর ঘর সাজানোর মধ্যে এমন কুৎসিৎ অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে! হল ইতিমধ্যেই প্রায় ভরিয়া গিয়াছিল, এখনও ক্রমাগত লোক ঢুকিতেছে—ছোট বড় গৃহস্থ পরিবার আর দু'চারজন বন্ধুর দল। মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যাই বেশী; রঙীন শাড়ী আর গয়নায় সাজানো পুতুলের মত বৌ আর তার স্বামী, কোন কোন স্বামীর কোলে একটি শিশু, আবার অনেক দলে অল্পবয়সী মেয়ে বৌ-এর সঙ্গে বাড়ীর বয়স্কা গৃহিণীও আছে, সাজগোজটা তারও একেবারে তুচ্ছ নয়। যশোদার মনে হয়, এরা সকলেই যেন তার চেনা মানুষ—ঠিক সামনের সিটের গল্প-বিভোর প্রেমিক প্রেমিকা দু'টিকে

যেমন চেনে, খানিক তফাতে পাশাপাশি প্রায় তিন গণ্ডা সিট দখল করিয়া যে পরিবারটি বসিয়াছে তাদেরও তেমনি চেনে। সবাই যেন তার প্রতিবেশী, পাশের বাড়ীর লোক।

তারপর ঘর অন্ধকার করিয়া ছবি আরম্ভ হইল। এতক্ষণ যশোদা এতটুকু অধীরতাও দেখায় নাই, এবার অন্ধকারে নিশ্চিন্তমনে ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে পর্দায় নন্দের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় নন্দ? এলোমেলো কতকগুলি নরনারী পর্দায় নড়াচড়া করিয়া আবোল-তাবোল কি সব বলিয়া গেল, তারপর আবার আলো জ্বলিয়া উঠিল।

যশোদা সুব্রতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কই সেই ছেলেটা তো গান করল না?'

সুব্রতা সবজান্তার মত বলিল, 'বই তো এখনো আরম্ভ হয়নি। বেশী বড় বই হ'লে হাফ-টাইমের আগে দেয়। কমিকটা সুন্দর হয়েছে, না?'

যোগমায়া সব-ভুলিয়া-যাওয়া উজ্জ্বল হাসির সঙ্গে বলিল, 'সত্যি। কি জন্দই হ'ল ছেলেটা মেয়েটার কাছে! বিয়ে করে' তবে রেহাই।'

কুমুদিনী বলিল, 'জন্দ হ'ল কিনা জানে!'

যোগমায়ার হাসি আরও উছলিয়া উঠিল: 'সত্যি! ঠিক্! বিয়ে করতেই তো চাইছিল।'

কমিক? বিয়ের কমিক? যশোদা রাগ করিয়া সোজা হইয়া বসে। এমন কেন হইয়াছে আজকাল, চোখের সামনে যা ঘটে তাও চোখে পড়ে না? মনে কষ্ট পাওয়ার কারণ ঘাটিয়াছে, মনে কষ্ট হোক, তাতে যশোদার আপত্তি নাই। হাল্-ভাঙ্গা নৌকার মত দিশেহারা হইলে চলিবে কেন?

আসল ছবি আরম্ভ হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নন্দের আবির্ভাব ঘটিল। নন্দই বটে, কিন্তু যেন কোন্‌দেশী নন্দ, একেবারে চেনাই যায় না। সায়েব বাড়ীর একটা ঘরে বাঙ্গালী বাড়ীর একটা মেয়ে অর্গান বাজাইয়া গান গাহিতেছিল এমন সময় আসিল সায়েবী পোষাক-পরা নন্দ। গান শেষ হওয়া পর্য্যন্ত মেয়েটি টেরও পাইল না কেউ ঘরে আসিয়াছে, তারপর চমকমারা, লজ্জাভরা আনন্দময় বিস্ময়ের সঙ্গে তাড়াতাড়ি অর্গান ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। তারপর অনেকক্ষণ একটি অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে আর অতি বুদ্ধিমান ছেলের কথাকাটাকাটি, হাসি তামাসা অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি চলিতে লাগিল। প্রথমেই নন্দ একটি গান শোনানোর অনুরোধ জানাইয়াছিল এবং মেয়েটি বলিয়াছিল নন্দর মত গায়কের সামনে সে কিছুতেই গান করিবে না: মাগো, তাই কি সে পারে, তার লজ্জা নাই? মনে হইতে লাগিল, এ তর্কের জের যেন তাদের মিটিবে না। কথায় কথায় অন্য কথা আরম্ভ করিয়া নিজেদের সম্বন্ধে কত কথাই যে তারা দর্শকদের জানাইয়া দিল, মাঝে মাঝে কত বাড়ীর লোক আর বাহিরের কত বন্ধু ও বান্ধবী বাজে ছুতায় আসিয়া দর্শকদের কাছে কৌশলে নিজেদের পরিচয় জানাইয়া চলিয়া গেল, তবু দুজনের মধ্যে কে আগে গান করিবে এসমস্যা কেবলি ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

তখন নন্দ বলিল, 'দু'জনে মিলে সেই গানটা গাই এসো।'

অর্গানের ধারে-কাছেও কেউ গেল না, নেপথ্যে কোথায় যেন গান আরম্ভ হওয়ার আগেই বাজনা বাজিয়া উঠিল—বাঁশী, বেহালা, হারমোনিয়ম, তবলা ইত্যাদির ঐক্যতান।

পালা করিয়া দু'জনে গান গায়, কাছাকাছি আসিয়া পরস্পরকে ধরি ধরি করে, চোখে চোখে চাহিয়া থাকে, হঠাৎ পাক দিয়া তফাতে সরিয়া যায়। সকলে মুগ্ধ হইয়া তাকে আর শোনে। যশোদা যাত্রায় এরকম ডুয়েট্ গান অনেক শুনিয়াছে, তবে এতটা খাপছাড়া আর মার্জ্জিত নয়। যাত্রার ডুয়েট গান যেন কাহিনী, আবেষ্টনী আর অভিনয়ের সঙ্গে বেশ মানায়।

তবে এখানে নন্দ আছে।

পর্দার কাহিনী আগাইয়া চলে, কোন্ দেশের মানুষের কোন্‌দেশী কাহিনী বুঝিয়া উঠিতে গিয়া যশোদার ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়। যে ঘটনা ঘটা উচিত সে ঘটনা ঘটে না, যার যে-কথা বলা উচিত সে সে-কথা বলে না, অথচ মাঝে মাঝে ঘরোয়া ঘটনা উঁকি দিয়া যায়, ঘরোয়া কথা কানে আসে। আগাগোড়া সবটা রূপকথা হইলে বোধ হয় যশোদা এতটা বিব্রত হইয়া পড়িত না। রূপকথাতেও আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্য থাকে। যশোদা যখন ভাবে, এইবার নন্দ রাগ করিবে, নন্দ তখন হাল্কা হাসি হাসে, নন্দর হাসি দেখিবার আগ্রহে যশোদা যখন সামনে একটু ঝুঁকিয়া পড়ে, নন্দ তখন রাগে আগুন হইয়া ওঠে।

যশোদার নিজেরই তখন রাগ হয়।

তারপর দেখা দেয় সুবর্ণ। সুবর্ণ একটি অপ্রধান পার্টে নামিয়াছে, অল্পবয়সী বৌ-এর পার্টে। এই পার্টটিই বোধ হয় সে ভাল করিতে শিখিয়াছে।

যশোদাকে সহজে চমক দেওয়া যায় না, সে ধীরে ধীরে নাড়া খায়। সুবর্ণের উপর যশোদা বিশেষ খুসী ছিল না, ছবি শেষ হওয়ার আগেই তার যেন বেশ মায়া জন্মিয়া যায়। মনের তলে একটা আশা যশোদার ছিল বৈকি যে একদিন নন্দ আর সুবর্ণ ফিরিয়া আসিবে, দুজনকে সে ক্ষমা করিবে আর ভাই আর ভাই-এর বৌকে নিয়ে সংসার করিয়া চলিবে সুখে। এখন মনে হইতে থাকে, নন্দ যেন তার সে আশা চিরদিনের জন্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তার ঘরের বৌকে করিয়া দিয়াছে সিনেমার অভিনেত্রী। জীবনে আর কোনদিন সে তার বাড়ীতে বৌ সাজিয়া থাকিতে আসিবে না।

বাড়ী ফিরিবার পথে সুব্রতা জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন দেখলে দিদি?'

যশোদা সংক্ষেপে বলে, 'বেশ।'

কেদার গম্ভীর চিন্তিত মুখে মাঝে মাঝে যশোদার মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু কিছু বলে না। মন্তব্য করে কুমুদিনী।

বলে, 'ছেলেটা ঠিক আমাদের নন্দর মত নয়? গলার আওয়াজটা পর্য্যন্ত একরকম। প্রথমটা আমি তো—'

কেদার বলে, 'আহা, চুপ কর না?'

কুমুদিনী ফোঁস করিয়া ওঠে, 'কেন, চুপ করব কেন?'

যশোদা ধীরে ধীরে বলে, 'নন্দর মত নয়, ওই আমাদের নন্দ।'

'ওমা সে কি কথা গো?' প্রথমে খানিকক্ষণ কুমুদিনী পলক না ফেলিয়া চাহিয়া থাকে, তারপর যেন প্রকাণ্ড একটা সমস্যা সমাধান করিয়া ফেলিয়াছে এই রকমভাবে বারকয়েক মাথা নাড়িয়া বলে, 'হুঁ, তাই তো বলি, জনে জনে কি এমন মিল থাকে। কেমনধারা সাজ পোষাক করেছে তাই, নইলে কি গোলমাল হ'ত! নন্দ বায়স্কোপ করছে!'

সমস্ত পথ গম্ভীর হইয়া কি যেন ভাবে কুমুদিনী, বাড়ী ফিরিয়া যশোদাকে একান্তে টানিয়া নিয়া বলে, 'বলি চাঁদের-মা, একটি বৌ দেখলাম জ্যোতিষ্ময় বাবুর বোনের মত, সে বুঝি—'

'সে সুবর্ণ।'

'মাগো! এসব কি!—' কুমুদিনীর মুখ দেখিয়া মনে হয় সে বুঝি আশ্চর্য্য হয় নাই, ভয় পাইয়াছে।

পরদিন সকালে কেদারকে ডাকিয়া যশোদা বলে, 'একটা কাজ করে' দেবে?'

এ রকম ভূমিকা করা যশোদার স্বভাব নয়। কেদার একটু অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। —'বল।'

'নন্দর ঠিকানাটা জেনে আসবে?'

'নন্দর ঠিকানা জেনে করবে কি চাঁদের-মা?'

যশোদা হাসে।—'বেশ মানুষ বটে তুমি, বেশ কথা সুধোচ্ছো।'

কেদার ইতস্ততঃ করিয়া বলে, 'মানে, কি জান চাঁদের-মা, আসবার হ'লে নন্দ নিজেই আসত আগে। বায়স্কোপে পাট্ করলে নাকি ঢের পয়সা পাওয়া যায় শুনেছি, ওর তো পয়সার অভাব নেই—'

'পয়সার কথা নয়, নিজে থেকে ফিরে আসতে হয়তো ভরসা পাচ্ছে না।'

তখন নন্দর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আনিবার কথা দিয়া কেদার চলিয়া যায় আর যশোদা যায় সত্যপ্রিয়ের বাড়ী। হঠাৎ তার মনে হইয়াছে, অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে ঝোঁকের মাথায় বাড়ী ছাড়িয়া গেলে অনেক সময় সাধ থাকিলেও ফিরিয়া আসিতে ভরসা পায় না, একথাটা সত্যপ্রিয়কে বুঝাইয়া বলা দরকার।

যামিনী স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াক, বৌকে নিয়া নিজের ভিন্ন সংসার পাতুক, যশোদার তাতে কোন আপত্তি ছিল না। মানুষের মধ্যে এরকম তেজই সে পছন্দ করে। কেবল যোগমায়ার সম্ভান-সম্ভাবনার জন্য এসময়টা তাকে নিয়া এরকম টানা-হ্যাঁচড়া করা সঙ্গত নয় বলিয়া প্রথমটা সে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এতকাল যে অনায়াসে শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করিয়াছে আর কয়েকটা মাস সে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না? বীরত্ব বা মনুষ্যত্ব তো পাগলামী নয়। বেহিসাবী তেজ দেখানো গোয়ার্তুমির সামিল।

প্রথমে যামিনী বুক ফুলাইয়া বলিত, কুঁড়ে ঘরে না থাইয়া দিন কাটাইবে তবু আর জীবনে কখনও শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করিতে যাইবে না। কিন্তু এখন মুখেও আর সে ওসব কথা

আশাপূর্ণা দেবী
৩৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

বলে না। কিছুদিন পরে সে একদিন যাচিয়া গিয়া সত্যপ্রিয়ের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িবে, তাকে কোনমতেই আটকানো যাইবে না। নিজের পায়ে ভর দিয়া কুঁড়ে ঘরে স্বাধীন জীবন যাপন করিবার মানুষ সে নয়—একটু নরম হইয়া থাকিলেই সত্যপ্রিয়ের রাজপ্রাসাদে আরামে জীবন কাটানোর সুযোগটা অন্তত যতদিন সামনে উপস্থিত আছে। যোগমায়ারও এ জীবন সহ্য হইতেছে না। এরকম অবস্থায় ওদের এখানে রাখিয়া কষ্ট দিয়া লাভ কি? ফিরিয়া যদি যাইতে হয়, ক'মাস পরে যাওয়ার চেয়ে, যোগমায়ার দিক হইতে ধরিলে, এখন যাওয়াই ভাল।

তাছাড়া আরেকটা কথাও যশোদার মনে হইতে থাকে—ওদের দু'জনকে বাড়ীতে রাখিয়া সত্যপ্রিয়কে খোঁচা দেওয়া যাইবে ভাবিয়া নিজের খুসী হওয়ার কথা। প্রতি-হিংসার জন্য এদের সে কষ্ট দিবে? এই অন্যায় কল্পনা মনে আসিয়াছিল বলিয়া এখন তার মনে হয়, ওদের ফিরিয়া যাওয়ার উপায়টা তারই করিয়া দেওয়া উচিত।

সত্যপ্রিয় কাগজ পড়িতেছিল, মুখ তুলিয়া একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই বলিল, 'এসো চাঁদের-মা।'

খানিক তফাতে মেঝেতে জাঁকিয়া বসিয়া যশোদা নির্দ্বিকার ভাবে বিনা ভূমিকায় বলিল, 'মেয়েকে এবার ফিরিয়ে আনুন?'

'মেয়েকে ফিরিয়ে আনব? আমি?'

'তাতে কি দোষ বলুন? বাপ তো আপনি? বড় কাঁদাকাটা করছে খুকি। এ সময়টা খুকীর পক্ষে—ছেলেমেয়ে হবে ওর জানেন না বোধ হয়। ফিরে আসবার জন্য মেয়েজামাই আপনার পাগল হয়ে আছে, কেবল না ডাকলে ভরসা পাচ্ছে না আসতে। আপনি যদি ডেকে পাঠান—'

সত্যপ্রিয় তার বিখ্যাত মৃদু হাসির সঙ্গে বলিল, 'ডেকে পাঠালেই তো ওরা মাথায় চড়ে' বসবে, চাঁদের-মা।'

যশোদা অবাক হওয়ার ভাণ করিয়া বলিল, 'মাথায় চড়ে' বসবে? আপনার? আপনার সামনে মুখ তুলে কথা কইবার সাহস ওদের আছে কিনা সন্দেহ, মাথায় চড়বে কোত্থেকে? তাছাড়া, বেয়াদবি যদি একটু করেই, মেয়ে জামাইকে সিধে রাখতে পারবেন না?'

সত্যপ্রিয় ভাবপ্রবণতার চিহ্নও দেখাইল না, শান্তভাবে বলিল, 'ওরা নিজে থেকেই আসবে।'

যশোদাও তা জানিত, কিছুক্ষণ সে আর বলিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না। সত্যপ্রিয়ের নির্দ্বিকার ভাব যশোদাকে সত্যসত্যই দমাইয়া দিয়াছিল। সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে কথা বলার এই একটা মস্ত অসুবিধা, এত সহজে সে মানুষের মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয় অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে পারে, উত্তেজনা, ভয়, আনন্দ, উৎসাহ হতাশা এসব যেন নিজের ইচ্ছামত পরের মধ্যে সংক্রামিত করিতে পারে। সত্যপ্রিয়ের উদাসীনতা দেখিয়া মনে হয়, মেয়েজামাই এর কথাটা আলোচনা করাও সে প্রয়োজন মনে করে না। অতি সাধারণ একটা ব্যাপার,

সংসারে এমন অনেক হয়, আপনা হইতেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। এজন্য মাথা-ঘামানোর কিছু নাই। যশোদারও মনে হইতে থাকে, ব্যাপারটা সে যত গুরুতর মনে করিয়াছে, হয়তো তেমন কিছুই নয়। এবিষয়ে আর কিছু না বলাই উচিত। তবে কোন কাজ আরম্ভ করিয়া মাঝখানে হাল ছাড়িয়া দেওয়া যশোদারও স্বভাব নয়।

'তা হয়তো আসবে, কিন্তু তার তো দেরী আছে। খুকীর মুখ চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনাই ভাল। আপনার ছেলেকে যদি পাঠিয়ে দেন—'

সত্যপ্রিয় মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আমি কাউকে পাঠাতে পারব না।'

কথাটা সে এমন স্পষ্টভাবেই বলিল যে মাথা নাড়িবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। যশোদা হাঁটু গুটাইয়া মেঝেতে ডান হাতের তালু পাতিয়া একটু কাত হইয়া মেঝেতে মেয়েদের বসিবার চিরন্তন ভঙ্গিতে বসিয়াছিল। উঠিয়া দাড়ানোর ভূমিকা হিসাবে যশোদা এবার সোজা হইয়া বসিল। আর তার কিছুই বলিবার নাই।

সত্যপ্রিয় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওরা বুঝি তোমায় পাঠিয়েছে ?'

যশোদা বলিল, 'না।'

সত্যপ্রিয় এতক্ষণ অন্যদিকে চাহিয়াছিল, কথা বলিবার সময় সে কদাচিৎ শ্রোতার মুখের দিকে তাকায়। এবার যশোদার চোখে চোখ মিলাইয়া সে খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল, তারপর মৃদুস্বরে বলিল, 'অন্য কেউ এবথা বললে বিশ্বাস করতাম না চাঁদের-মা। তবে তোমার কথা আলাদা। তুমি কখনো মিথ্যা বল না।'

সত্যপ্রিয়ের দৃষ্টি দেখিয়া যশোদা এক মুহূর্ত্তের জন্য শিহরিয়া উঠিয়াছিল। যশোদার স্নায়ুগুলি এরকম শিহরণের উপযোগী করিয়া তৈরী হয় নাই, রাতদুপুরে হঠাৎ বাড়ীর উঠানে অন্ধকারে একটা ভূত দেখিলেও সে ভাল করিয়া চমকাইয়া ওঠে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সত্যপ্রিয়ের দৃষ্টিতে যে-ভাষা তার স্পষ্ট চোখে পড়িয়াছে ভূত দেখার চেয়ে তা চমকপ্রদ। ধনঞ্জয়ের চোখে একদিন যশোদা এ ভাষা দেখিয়াছিল, তবে সত্যপ্রিয়ের চোখের এমন বিশ্বগ্রাসী মারাত্মক ক্ষুধার সঙ্গে ধনঞ্জয়ের সেই মৃদু কামনার অভিব্যক্তির তুলনাই হয় না। হঠাৎ যশোদার একটা অদ্ভুত ধরণের লজ্জা বোধ হয়, অনেকদিন সেরকম লজ্জার সঙ্গে তার পরিচয় ঘুচিয়া গিয়াছিল।

চোখের অস্বাভাবিক দীপ্তি নিভাইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'তবু, মেয়েজামাইকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি কিছু করতে পারব না চাঁদের-মা। তুমি নিজে যখন এসেছ, আমার মেয়ের ভালর জন্য এসেছ, তোমার জন্য আমি এইটুকু করতে পারি—ওদের ক্ষমা করলাম। তুমি গিয়ে ওদের বলতে পার, ওরা যদি ফিরে আসে আমি ওদের কিছু বলব না।'

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

গল্প-সাহিত্য ও তার ঐতিহ্য

কাজি আফসার উদ্দিন আহমদ

বর্তমানে সাহিত্যরসিকদের কাছে ছোটোগল্পের মূল্য সবদিক দিয়েই বেশি। তার কারণ, এখনকার যুগটা হচ্ছে যন্ত্র-সভ্যতার যুগ। যন্ত্রের সংগে সমান তালে পা ফেলতে গিয়ে নিয়মানুবর্তিতার নাগপাশে বদ্ধ মানুষও আস্তে আস্তে পিচ্ছিল গতিতে ক্রমশ যন্ত্র বনে' যাচ্ছে।

ব্যস্ততার ভিতর বড়ো-বড়ো বইয়ের জন্যে সময় আর মনের সুস্থ সবল গতির সংকুলান করা মোটেই সম্ভব নয়। আর ধৈর্যের অভাবও পরিলক্ষিত হচ্ছে আজকের দিনে বেশি করেই (টেনিসন)। তাই না আমরা রাস্তায় ট্রামে-বাসে ট্রেনে-জাহাজে-এআরোপ্লেনে বসে' বা শুয়ে-শুয়েই অনেক টুকরো-টুকরো সময়গুলোর সদ্ব্যবহার করে' নিচ্ছি। আর এক-সংখ্যাতেই একটা গল্প শেষ হয়ে গেছে, অমন পত্রিকার সংখ্যা আজকাল বিস্রীংস অধিক।

সম্প্রতি কেউ কেউ বলছেন, হয়তো-বা একদিন উপন্যাসের যায়গা দখল করে' বসবে এই ছোটোগল্প। কিন্তু বুদ্ধিজীবী সুচতুর পণ্ডিতের চোখে এ-অনুমান নির্ভয়ে আর নিঃসন্দেহে অমূলক বলে' ধরা পড়ে' যাবে। কারণ, উপন্যাস চিরকালই থাকবে। তার অতি সাধারণ কারণ সংক্ষেপে বলতে গেলে, উপন্যাস উপন্যাসই আর গল্প গল্পই ; একে অন্যের অভাব দূর করতে পারে না।

উপন্যাস জটিল মানব-জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আর বিভিন্নমুখী বৈচিত্রের যে-আলেখ্য বিশদ ও বিস্তারিতভাবে আমাদের চোখের সামনে ধরে' দেয়, ছোটোগল্পে তা সম্ভবে না ; কেননা এ-জন্যে চাই সুপরিসর বিস্তীর্ণ মাঠ, যা ছোটোগল্পে একান্তই অভাব। ঠিক এ-কারণেই আবার গল্প-সাহিত্যের যে একটা প্রধান সমস্যা evolution of character (চরিত্রের ক্রমবিকাশ) তারও সহজ সরল সমাধান ছোটোগল্পে আমরা পেতে পারি নে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প-লিখিয়ে মোঁপাশাঁ ছোটোগল্পের সংকীর্ণ যায়গার মধ্যেই চরিত্র-অংকণে যে সুনিপুণ হাতের পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর উপন্যাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যায় কৈ ? সাধারণত গল্পে আমরা পাই চরিত্রের অংশবিশেষের একটি বিশিষ্ট রূপ।

হয়তো কোনো চরিত্রকে দেখলাম,—একটা বদ্ধ মাতাল, চরিত্রহীন বা অন্য-কিছু। কিন্তু কেমন করে' কতোদিন আগে ধীরে-ধীরে তার অধঃপতন সুরু হয়েছিলো, কেমন করে' কতোটা ভাগ্যবিপর্যয় আর পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে সে অবনতির সোপান বেয়ে নেমে এলো, তার শেষ-পরিণামই বা কী, সে-কথা জানবার সুযোগ গল্পে আমাদের হয় না। অ্যানাকারেনিনা-য় লেভিনের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বা রোমলা-র টিটোর নৈতিক অবনতির সুস্পষ্ট বিকাশ, ছোটো-গল্পের ক্ষুদ্র আবেষ্টনী ছাড়িয়ে যাবে, কোনো সন্দেহই এতে স্থান পেতে পারে না।

সংসারে এমন অনেক হয়, আপনা হইতেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। এজন্য মাথা-ঘামানোর কিছু নাই। যশোদারও মনে হইতে থাকে, ব্যাপারটা সে যত গুরুতর মনে করিয়াছে, হয়তো তেমন কিছুই নয়। এবিষয়ে আর কিছু না বলাই উচিত। তবে কোন কাজ আরম্ভ করিয়া মাঝখানে হাল ছাড়িয়া দেওয়া যশোদারও স্বভাব নয়।

'তা হয়তো আসবে, কিন্তু তার তো দেরী আছে। খুকীর মুখ চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনাই ভাল। আপনার ছেলেকে যদি পাঠিয়ে দেন—'

সত্যপ্রিয় মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আমি কাউকে পাঠাতে পারব না।'

কথাটা সে এমন স্পষ্টভাবেই বলিল যে মাথা নাড়িবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। যশোদা হাঁটু গুটাইয়া মেঝেতে ডান হাতের তালু পাতিয়া একটু কাত হইয়া মেঝেতে মেয়েদের বসিবার চিরন্তন ভঙ্গিতে বসিয়াছিল। উঠিয়া দাড়ানোর ভূমিকা হিসাবে যশোদা এবার সোজা হইয়া বসিল। আর তার কিছুই বলিবার নাই।

সত্যপ্রিয় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওরা বুঝি তোমায় পাঠিয়েছে?'

যশোদা বলিল, 'না।'

সত্যপ্রিয় এতক্ষণ অন্যদিকে চাহিয়াছিল, কথা বলিবার সময় সে কদাচিৎ শ্রোতার মুখের দিকে তাকায়। এবার যশোদার চোখে চোখ মিলাইয়া সে খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল, তারপর মৃদুস্বরে বলিল, 'অন্য কেউ এরকম বললে বিশ্বাস করতাম না চাঁদের-মা। তবে তোমার কথা আলাদা। তুমি কখনো মিথ্যা বল না।'

সত্যপ্রিয়ের দৃষ্টি দেখিয়া যশোদা এক মুহূর্তের জন্য শিহরিয়া উঠিয়াছিল। যশোদার স্নায়ুগুলি এরকম শিহরণের উপযোগী করিয়া তৈরী হয় নাই, রাতদুপুরে হঠাৎ বাড়ীর উঠানে অন্ধকারে একটা ভূত দেখিলেও সে ভাল করিয়া চমকাইয়া ওঠে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সত্যপ্রিয়ের দৃষ্টিতে যে-ভাষা তার স্পষ্ট চোখে পড়িয়াছে ভূত দেখার চেয়ে তা চমকপ্রদ। ধনঞ্জয়ের চোখে একদিন যশোদা এ ভাষা দেখিয়াছিল, তবে সত্যপ্রিয়ের চোখের এমন বিশ্বগ্রাসী মারাত্মক ক্ষুধার সঙ্গে ধনঞ্জয়ের সেই মৃদু কামনার অভিব্যক্তির তুলনাই হয় না। হঠাৎ যশোদার একটা অদ্ভুত ধরণের লজ্জা বোধ হয়, অনেকদিন সেরকম লজ্জার সঙ্গে তার পরিচয় ঘুচিয়া গিয়াছিল।

চোখের অস্বাভাবিক দীপ্তি নিভাইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'তবু, মেয়েজামাইকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি কিছু করতে পারব না চাঁদের-মা। তুমি নিজে যখন এসেছ, আমার মেয়ের ভালর জন্য এসেছ, তোমার জন্য আমি এইটুকু করতে পারি—ওদের ক্ষমা করলাম। তুমি গিয়ে ওদের বলতে পার, ওরা যদি ফিরে আসে আমি ওদের কিছু বলব না।'

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

গল্প-সাহিত্য ও তার ঐতিহ্য

কাজি আফসার উদ্‌দিন আহমদ

বর্তমানে সাহিত্যরসিকদের কাছে ছোটোগল্পের মূল্য সবদিক দিয়েই বেশি। তার কারণ, এখনকার যুগটা হচ্ছে যন্ত্র-সভ্যতার যুগ। যন্ত্রের সংগে সমান তালে পা ফেলতে গিয়ে নিয়মানুবর্তিতার নাগপাশে বদ্ধ মানুষও আস্তে আস্তে পিচ্ছিল গতিতে ক্রমশ যন্ত্র বনে' যাচ্ছে।

ব্যস্ততার ভিতর বড়ো-বড়ো বইয়ের জন্যে সময় আর মনের সুস্থ সবল গতির সংকুলান করা মোটেই সম্ভব নয়। আর ধৈর্যের অভাবও পরিলক্ষিত হচ্ছে আজকের দিনে বেশি করেই (টেনিসন)। তাই না আমরা রাস্তায় ট্রামে-বাসে ট্রেনে-জাহাজে-এআরোপ্লেনে বসে' বা শুয়ে-শুয়েই অনেক টুকরো-টুকরো সময়গুলোর সদ্ব্যবহার করে' নিচ্ছি। আর এক-সংখ্যাতেই একটা গল্প শেষ হয়ে গেছে, অমন পত্রিকার সংখ্যা আজকাল বিশ্রীরং অধিক।

সম্প্রতি কেউ কেউ বলছেন, হয়তো-বা একদিন উপন্যাসের যায়গা দখল করে' বসবে এই ছোটোগল্প। কিন্তু বুদ্ধিজীবী সুচতুর পণ্ডিতের চোখে এ-অনুমান নির্ভয়ে আর নিঃসন্দেহে অমূলক বলে' ধরা পড়ে' যাবে। কারণ, উপন্যাস চিরকালই থাকবে। তার অতি সাধারণ কারণ সংক্ষেপে বলতে গেলে, উপন্যাস উপন্যাসই আর গল্প গল্পই; একে অন্যের অভাব দূর করতে পারে না।

উপন্যাস জটিল মানব-জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আর বিভিন্নমুখী বৈচিত্রের যে-আলেখ্য বিশদ ও বিস্তারিতভাবে আমাদের চোখের সামনে ধরে' দেয়, ছোটোগল্পে তা সম্ভবে না; কেননা এ-জন্যে চাই সুপরিসর বিস্তীর্ণ মাঠ, যা ছোটোগল্পে একান্তই অভাব। ঠিক এ-কারণেই আবার গল্প-সাহিত্যের যে একটা প্রধান সমস্যা evolution of character (চরিত্রের ক্রমবিকাশ) তারও সহজ সরল সমাধান ছোটোগল্পে আমরা পেতে পারি নে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প-লিখিয়ে মোঁপাশাঁ ছোটোগল্পের সংকীর্ণ যায়গার মধ্যেই চরিত্র-অংকণে যে সুনিপুণ হাতের পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর উপন্যাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যায় কৈ? সাধারণত গল্পে আমরা পাই চরিত্রের অংশবিশেষের একটি বিশিষ্ট রূপ।

হয়তো কোনো চরিত্রকে দেখলাম,—একটা বদ্ধ মাতাল, চরিত্রহীন বা অন্য-কিছু। কিন্তু কেমন করে' কতোদিন আগে ধীরে-ধীরে তার অধঃপতন সুরু হয়েছিলো, কেমন করে' কতোটা ভাগ্যবিপর্যয় আর পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে সে অবনতির সোপান বেয়ে নেমে এলো, তার শেষ-পরিণামই বা কী, সে-কথা জানবার সুযোগ গল্পে আমাদের হয় না। অ্যানাকারেনিনা-য় লেভিনের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বা রোমলা-র টিটোর নৈতিক অবনতির সুস্পষ্ট বিকাশ, ছোটো-গল্পের ক্ষুদ্র আবেষ্টনী ছাড়িয়ে যাবে, কোনো সন্দেহই এতে স্থান পেতে পারে না।

জীবনের সুস্পষ্ট সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে চিনতে বা বুঝতে হ'লে, তার সংগে চাই অনেক দিনের ঘনিষ্ঠ নিবিড় পরিচয়। এ-নিয়ম রুক্ষ বাস্তব জীবনে নরনারীর পক্ষে যেমন প্রতিষ্ঠিত সত্য, স্বচ্ছ, গল্পের নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। কিন্তু ছোটোগল্পের নায়ক-নায়িকার সংগে আমাদের পরিচয় বা মিলন পলকের জন্যে মাত্র—জানবার বা চিনবার অবকাশ না দিয়েই অজ্ঞাত আর অপরিচিতরূপে তারা রহস্যের অন্তরাল থেকেই পাঠকের মনের উপর স্থায়ী ও সুন্দর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

সাধারণত উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার সংগে পরিচয় হয় অনেকটা সময়ের : সে-জন্যে তাদের রেখাগুলোও তীক্ষ্ণ আর উজ্জ্বল।

কিন্তু ছোটোগল্পে গুটিকতক অর্থপূর্ণ আক্ষরিক কথাতেই এমনি জটিল আর বক্র সমস্যা লুকিয়ে থাকতে পারে, যা খুব লম্বা লম্বা বক্তৃতায়ও মেলে না। ছোটোগল্প হচ্ছে সে-ধরণের, যা নাকি শেষ করতে আধঘণ্টা, নয়তো বড়ো জোর এক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে (এলেন পো)। মোট কথা, যে-গল্পকে একবার পড়তে বসে' সহজে আর অক্লেশে শেষ করে' ফেলা যায়, তাকেই আমরা ছোটোগল্পের অন্তর্ভুক্ত করবো। তাই বলে' ছোটোগল্প সংক্ষিপ্ত আকারের উপন্যাস নয় অথবা যে-বিষয় একশো নয়তো দু-শো পৃষ্ঠায় বিবৃত করা চলে তারই তাৎপর্য।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে গল্প আর উপন্যাসের ভেতর পার্থক্য খুব বেশি একটা কেউ লক্ষ্য করতো না। চালর্স ডিকেন্সের 'ক্রিস্‌মাস বুক্স'-কে উপন্যাস বলা ভিন্ন গত্যন্তর নেই, যদিচ সেটা একটা বড়ো ছোটোগল্প। অবিশ্যি, ও-গুলো সম্পূর্ণ নিজস্ব আর বিশিষ্ট ভংগীতে গল্প-বলার আর রচনার কলা-চাতুর্যে, চরিত্র-বিশ্লেষণে, রস-সম্পদে সুসমৃদ্ধ। ডিকেন্সের সময়ের গল্পের বিষয়বস্তু আর লিখনপ্রণালীর সংগে বর্তমান গল্প-সাহিত্যের বিষয়বস্তু আর রচনাপ্রণালীর পার্থক্য অনেক। এমনতরো অগুন্তি মধ্যম গ্রামের সাহিত্যের আজ আর অভাব হবে না—যাদের অবস্থা হচ্ছে অনেকটা ত্রিশংকুর মতো, মানে গল্পও নয় উপন্যাসও নয়। কিন্তু আস্তে আস্তে লিখিয়েদের ধারণা সম্পূর্ণ ভাবে বদ্‌লে যাচ্ছে। গল্প উপন্যাস থেকে আলাদা হবে শুধু আকারেই নয়, উদ্দেশ্যে, প্লটে, আখ্যানভংগী—সব দিক দিয়েই গল্পের বিশিষ্ট রীতি সে-সব লিখিয়েরা বজায় রাখতে চান।

ছোটোগল্পের আখ্যানভংগী এমন হওয়া চাই, যা কিনা নির্ধারিত সীমার মধ্যে স্পষ্ট আর পরিপূর্ণ করে' ব্যক্ত করা যেতে পারে। এ বিষয়ে লেখকের চাইতে পাঠকের রসগ্রাহী চিত্তই বিচারের মাপকাঠি। উপন্যাসের স্বাধীনতা ও স্বতস্ফূর্তিতা এদিক দিকে যথেষ্ট ; গতি তার সাবলীল, পরিষ্কার আর স্বচ্ছন্দ।

অনেক সময় ছোটোগল্প-লিখিয়েরাও নির্দিষ্ট সীমার বন্ধন ছাড়িয়ে চলে' যাবার চেষ্টা করেছেন। ষ্টিভেনসনের নিউ এ্যারাথিয়ান নাইটস্—কোনানডয়েল আর্থারের 'সারলক হোম-'এ তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই। এ সব যায়গায় তাঁরা গল্প আর উপন্যাসের ভেতর

গুটিকতক বিষয়ে সাদৃশ্য বজায় রাখতে চেয়েছেন ; তাই না সেগুলো উপন্যাসেরই মূর্তি পেয়েছে, এবং সে-গুলোকে ঠিক ছোটোগল্পের পর্যায়ভুক্ত করতে পাঠক-মন ইতস্তত করে।

এ-বিষয়ে উপন্যাসের সংগে ছোটোগল্পের কোনো মিল নেই, বরং রয়েচে নাটকের। নাট্যকারকেও এমনি ভাবে দৃষ্টি রাখতে হয়, যাতে করে' নাটক দীর্ঘ না হয়ে পড়ে। দার্শনিক-গুরু এরিষ্টটলের ভাষায় Single Sitting-এ শেষ হয়ে যেতে পারে এ-রকম ভাবে নাট্যকারকে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে হয়।

মঞ্চের উপযোগী নাটক দু-হাজার লাইনের বেশি হওয়া উচিত নয় ; সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ দু-হাজার একশো আট লাইন মাত্র। সিলার নাটক লিখেছেন বিস্তর, কিন্তু এতো বড়ো-বড়ো যে, তার একখানাও ঠিক অভিনয় উপযোগী নয়। তাহ'লে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নাট্যকার আর গল্প-লিখিয়ে দু-জনেই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সুষ্ঠু ও চিত্তাকর্ষক ভাবে আপন-আপন কায সমাধা করতে বাধ্য।

এ-কারণেই, তাই, বিষয়বস্তু নির্বাচনে উভয়েরই বিশেষ বিবেচনা আর দক্ষতার প্রয়োজন।

একটা গল্প একের বেশি ঘটনাকে কেন্দ্র করে'ই হোক অথবা চরিত্রের একটা পৃথক অংশ বিশ্লেষণ করেই হোক, তার পরিপূর্ণ সাফল্যের অনেকটাই নির্ভর করে গল্প-বলার নিজস্ব সর্বাংগ সুন্দর কৌশলের উপর। উপন্যাসে যে-ঘটনা প্রকাশ করতে হ'লে যতোটা সময় চাই, তার চেয়েও অনেক গুণ সময়ের অনেকগুলো ঘটনার সংমিশ্রনে গল্প হতে পারে। আরভিঙ-এর রিপভ্যান উইনক্ল-এ আমরা পাই সারাজীবনের একটা রহস্যময় কাহিনী, কিন্তু সেটা এমনি কৌশলে এতো অল্প যায়গার মধ্যে বলা হয়েছে,—বিশেষ করে' রিপের ঘুমোনোর সুরু থেকে জাগরণ, এ-সময়টার ফাঁকে কোনো অনাবশ্যক ঘটনাই স্থান পায়নি গল্পে, তাইতো ও-তে পাঠকের আগ্রহ আর নির্মুক্ত কৌতূহল ক্ষুণ্ণ না হয়ে সমান তালে উত্তরোত্তর চমৎকার বেড়েই চলে।

আরোও একজনের কথা এখানে আলোচনা করা অবান্তর হবে না। তিনি শেকভ। শেকভের গল্প প্লটপ্রধান নয় ; কথাটা হয়তো শোনাবে নতুন, কাজেই বুঝিয়ে বলা দরকার পড়ছে। ডিকেন্স যেমনতরো প্লট নিয়ে গল্প লিখতেন, সে-রকম প্লট শেকভ সম্পূর্ণ ভাবেই বর্জন করেছিলেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা-কিছু ধারাবাহিক ভাবে বলা বা আঁকা, বিচিত্র বিভিন্ন ঘটনাবলীকে একটা সম্বন্ধের সুতোয় বেঁধে শেষ পরিচ্ছেদে একেবারে এক করে' দেয়া এই ছিলো ডিকেন্সের প্লট। তাঁর নায়ক-নায়িকার হয় মিলন, নয় মরণ বা ঐ রকম সুনিশ্চিত একটা-কিছু। একটা অনিশ্চয়তার মধ্যিখানে তাদের ফেলে রেখে তিনি কখনোও বইয়ের কাহিনীর পরিসমাপ্তি করতেন না।

কিন্তু শেকভ-এর বইয়ে সবই কেমনতরো ছাপছাড়া এলোমেলো ভাবে একটার-পর-একটা চলেছে। তাদের মধ্যে আবার কোনো ঐক্য পর্যন্ত নেই। তারপর নায়ক নায়িকা নিয়ে

গল্প বা উপন্যাস রচনার চিরপ্রচলিত যে-রীতি রয়েছে, সেটাকেই শেকভ যেন বাদ দিয়ে চলতেন, মনে হয়। তাঁর বিষয়বস্তুতে হাজার লোক জটলা করছে, প্রত্যেকেই ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে অপূর্ব। এর মধ্যে সুখ, দুঃখ, আশা, ভয়, প্রেম সবই রয়েছে, অথচ মজা হচ্ছে কোনো বিশেষ দুটো চরিত্রকে অন্য সমস্ত থেকে তফাৎ করে', বিশেষ করে' দেখা চলে না।

শেকভের চরিত্রগুলিই আসল—প্রত্যেকেই আসল; প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে একটু নিজস্ব বিশেষত্বের ছাপ; কা'কেও বাদ দেয়া চলে না, অবজ্ঞাও করা চলে না। বইয়ের সুরু আর শেষ দুটোই আকস্মিক; কাহিনীর শেষে দেখা গেল, যে-সব চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে তিনি এতক্ষণ চেষ্টা-চরিত্র করছিলেন, তাদের কখন কোথায় ফেলে কোন্ অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে গেলেন, তা বোঝা গেল না। বিশেষ কোনো সর্বজন-প্রার্থিত ঘটনাও ঘটলো না; মানে, কা'রও মৃত্যু হলো না, কা'রও প্রণয়িনী কিংবা প্রণয়ীর সঙ্গে বিয়েও হলো না। আশ্চর্যের বিষয়, বইখানাও শেষ হয়েছে।

শেকভ একটা নতুন ধরণের প্লটের সৃষ্টি করেছেন। তাতে ধারাবাহিকতা নেই, পরিসমাপ্তি নেই—রয়েছে শুধু বাস্তব জীবন থেকে নেয়া কতকগুলি অনিবার্য অথচ অসংলগ্ন ঘটনা।

ছোটোগল্পের রচনা-পদ্ধতির দ্বিতীয় লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, একতা আর সংগতি। একতা বললে আমরা উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কার্য এবং সময় বিশেষে পাঠকের মনের উপর প্রভাবেরও একতা বুঝবো। ছোটোগল্পের আলোচ্য উদ্দেশ্য হবে একটা, আর তাকেই সন্তর্পনে প্রাধান্য দিয়ে যেতে হবে।

একটি মাত্র বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে' পরিপূর্ণ রসসৃষ্টি করবার প্রয়াস উপন্যাসের চেয়ে ছোটোগল্পে অনেক দুরূহ। ঔপন্যাসিক স্থান-কাল-পাত্র সব দিক দিয়েই নির্জলা কৃতিত্ব দেখাবার সুবিধে ভোগ করতে পারেন গল্প-লিখিয়ের চেয়ে বেশি। এবং উপন্যাসে একাধিক বিষয়বস্তু থাকার জন্যে উপন্যাসের চরম সাফল্য একটা ঘটনার treatment-এর ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু গল্পে বিষয় এক, সুতরাং তারই সঙ্গে লিখিয়ের সমস্ত সুনাম আর দুর্নাম আষ্টেপিষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। এ-সব কারণে অনেক সমালোচকের মতে উপন্যাসের উপরে গল্পের স্থান। গল্পে অনাবশ্যক বিষয় নিয়ে অবতারণা করা তো চলেই না অধিকন্তু বিভিন্ন অংশকে মূল আখ্যানের অংগীভূত আর অধীন রাখার প্রয়োজন হয় সর্বাগ্রে।

ছোটোগল্পে রচনাপ্রণালীর কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম-কানুন নির্ণয় করা যায় না। কারণ, উদ্দেশ্য আর বিষয় হিসেবে নিয়মও পরিবর্তনীয়। গল্পে dialogue একেবারে নাও থাকতে পারে কিংবা খুব কম বা আবার সমস্তটাই কথোপকথনের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বর্ণনাবাহুল্য সর্বথা বর্জনীয়।

মূল আখ্যানবস্তুর উপাদান কী ধরণের হওয়া উচিত তারও কোনো সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করা চলে না। ওয়াশিংটনের ষ্টাউট জেন্টলম্যান-এ আমরা দেখতে পাই আগাগোড়াই একটা অদ্ভুত খেয়াল আশ্চর্য কৌশলে গল্পে রূপায়িত হয়েছে; বিষয়বস্তুটাও সামান্য বলেই

তার প্রভাব আর সবায়ের চাইতে বেশি। পো-র গোল্ডবাগ একটা ধাঁধা; তাঁর মিসট্রিজ অব মেরি রোজেট-এর লক্ষ্য উত্তেজনা। হথর্ণের ওয়েকফিল্ড গোগলের বিখ্যাত বই ম্যাড ম্যানস্ ডায়েরীর মতোনই কতকগুলি বাস্তব সত্যের উপর ভিত্তি করে' একটা চরিত্র গড়বার চেষ্টা।

নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এই পৃথিবী নতুন নতুন বেশে আর রহস্যে আর অবয়বে প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনে ধরা দিচ্ছে; আর তার বিচিত্র অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে এতো প্রকারের উপাদান জোগানো সম্ভবও নয়—আর কোনো নির্দিষ্ট উল্লেখ করা অসম্ভব।

এ-সম্বন্ধে দুজন শ্রেষ্ঠ গল্প-লিখিয়ের অভিমত আলোচনা করলে অপ্রাসংগিক হবে না। হথর্ণের নোট বুকস্-এ গল্প লিখবার অনেক উপদেশ আর উপকরণ দেয়া রয়েছে; তিনি কোনো উদ্দেশ্য আগে থেকেই চিন্তা করে' রাখতেন না; দৃশ্যমান ঘটনাবলীর মধ্যেই তিনি তাঁর উপাদান সংগ্রহ করতে থাকতেন। অবিশ্যি, হথর্ণের অদ্ভুত প্রতিভার কথা ভাবলে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

ষ্টিভেন্সন তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন গল্পকে। গ্রেহাম বালফুর সংগে কথা-কওয়ার সময় ষ্টিভেন্সন বলেছিলেন: আমি যতোদূর জানি, গল্প লেখার মাত্র তিনটে উপায় রয়েছে। তুমি কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে' তাতে চরিত্রের সমাবেশ করতে পারো—কোনো চরিত্রকে অবলম্বন করে' সময়োপযোগী ঘটনা সন্নিবেশে তাকে সংপ্রসারিত করতে পারো অথবা কোনো একটা বিশেষ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে' তা সার্থক করার তাগিদে মানবীয় লীলাখেলার সাহায্য নিতে পারো।

উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন: দি মেরি ম্যান।

স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমায় কোনো দ্বীপবাসীর ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি আরম্ভ করলেন গল্পটা, আর সে-দ্বীপের মধ্যে তাঁর মনে যে-ভাবের উদয় হয়েছিলো সেটাকেই বাইরে প্রকাশ করবার জন্যে গল্পটা ক্রমশ বেশ ঘনীভূত করে' তুললেন।

ষ্টিভেন্সনের এই শ্রেণীবিভাগ মেনে নিতে যদিও আমাদের দ্বিধা হয়, তবু গল্প লেখার অনেক-কিছু জ্ঞাতব্যের এতে খোঁজ পাওয়া যায়।

ছোটোগল্পের বিশেষত্ব ও তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আরো ব্যাপক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে রস-সাহিত্য হিসাবে এর একটা বিশিষ্ট আকৃতি আর ঐতিহ্য রয়েছে।

মোমবাতি

গোপী রায়

সকাল থেকে একঘেয়ে বৃষ্টির আর বিরাম নেই। চেপে-চেপে কখনও বা ঝেঁকে-ঝেঁকে বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশের চেহারা কেমন যেন উদাস, বিষণ্ণ। দূরে ট্রামের অস্পষ্ট গোঙানি, মাঝে-মাঝে হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস দিনটিকে বিধুর কোরে তুলেছে।

শাড়ির আঁচল গায়ে ভালো কোরে জড়িয়ে সুপ্রভা হস্টেলের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো, ভাঙা খোঁপাটা গোছাতে-গোছাতে মনে-মনে বল্লে: কী বিশ্রী দিন! বৃষ্টির দিনে কোলকাতার এমন অদ্ভুত চেহারা সে ভাখেনি এর আগে। লাবণ্য নেই, রঙ্ নেই—আছে কেবল কাদা আর জল। ভারি বিশ্রী লাগে। মন খারাপ হ'য়ে যায়—কিছু ভালো লাগেনা।

আজ যে কী হয়েছে সুপ্রভার! প্রকৃতির ন্যায়সংগত আদরকে পর্যন্ত সে বুক পেতে গ্রহণ কোর্‌তে পার্‌ছে না। কোথায় যেন ফাঁক র'য়ে গেছে, কোথায় যেন বাধ্‌ছে। অ ভা ব! সমস্ত হৃদয় ভরে' আছে তা'র অভাবের কীট-দংশন। অভাব যে আছে, একটু আগে পর্যন্ত তা'র মনে হয়নি। আজ এ কী হ'ল তার!

ছুটির দিন। ইস্কুলের তাড়া ছিলো না। কিন্তু, ট্যাশানিতে যাওয়ার বিশেষ দরকার ছিলো। সুনীতির আবার সামনে পরীক্ষা। তবু, যাবার বিশেষ উৎসাহ তা'র মনে নেই। আলস্যে সমস্ত শরীর ম্যাজম্যাজ কোর্‌ছে। সুপ্রভা ক্লান্ত হোয়ে প'ড়েছে। মীনা একটু আগে ভবানীপুরে চলে' গেছে তা'র স্বামীর বাসায়। ফিরবে কাল। কতোদিন এই নিয়ে সে তা'কে ঠাট্টা কোরেছে। মীনার মুখ আরক্তিম হোয়ে উঠেছে, সুপ্রভার পিঠে দুম কোরে কিল বসিয়ে বোলেছে: 'যা, ভারি দুষ্টু তুই!'

বেশ আছে ওরা, সুপ্রভা ভাব্‌লে, নিরাপদ আশ্রয়ের মতো কিছু নেই এই পৃথিবীতে। জীবন। জীবনের অপরূপ স্বাদ। আর তা'র রোমাঞ্চ। উন্মাদনা। স্বামীর কাছে যাবার আগে মীনার মুখের উজ্জ্বলতা তা'র চোখ এড়ায়নি। তা'র শিক্ষয়িত্রী-পাণ্ডুর গালে একটু আগে রঙ্ এসেছিলো, ঠোঁটেও বুঝি রক্ত! চমৎকার লেগেছিলো সুপ্রভার, মীনা যখন বোলেছিলো, 'চোল্‌লাম রে, প্রভা। না-গেলে ভারি রাগ কোর্‌বে আবার।'

সুপ্রভা বোলেছিলো, 'খুব মিথ্যে কথা বোল্‌তে শিখেছিস যাহোক্! কা'র মন খারাপ কোর্‌বে—তোর, না তা'র?'

'আমি যেন যাবার জন্যে ছটফট করি!'

'তুই মরে'ছিস্, মীনা।'

মীনা আর দাঁড়ায়নি। একটি মুহূর্তকেও ব্যর্থ হ'তে দিতে সে নারাজ। জল-ঝড়কে পর্যন্ত গ্রাহ্য করেনি।

কী সুখি এরা, সুপ্রভা আকাশের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। কী শান্ত জীবন! দু'জনের উপার্জন! তা' মিলিয়ে যে-অংকটা দাঁড়ায়, তা'তে কী স্বচ্ছন্দে এবং আরামেই না দিন কাটে। আর, সে প'ড়ে র'য়েছে হস্টেলের এই অন্ধ কুঠরীতে—আজ দীর্ঘ পাঁচটি বছর। যাবার মতো কোনো আশ্রয়ই তা'র নেই। বাবা আছেন, মা আছেন, আছে ভাই এবং বোনেরা। কিন্তু, সে ওই শুধু থাকার মধ্যে। সেখানে সে সুখি হোতে পার্‌বে না। অতো বড়ো গ্রীষ্মের ছুটিটায় সে এখানে আটকে রইলো। ভাব্‌তে কষ্ট হয়,—কী বিশ্রী যে একা লাগ্‌ছে তা'র!

সুপ্রভার আজ এই সর্বপ্রথম মনে হ'ল যে, সে একা। হাওয়ার মতো নিঃসংগ। এই বিরাট পৃথিবীতে তা'র নিজের বোল্‌তে কেউ নেই, কোনো আশ্রয় নেই—যেখানে সে এক বেলার জন্যেও মাথা গুঁজে থাক্‌তে পারে, তা'র অতি-শ্রান্ত মনকে বিশ্রাম দিতে পারে।

কিন্তু, আশ্রয় কী তা'র ছিলো না? কিসের ভাবনা ছিলো তা'র? স্বামী তো সে পেয়েছিলো মনের মতোই। সুপুরুষ, তা'র উপর বিদ্বান, লোভনীয় উপার্জন। কেন সে তা'কে ছেড়ে এলো, অস্বীকার কোর্‌লো! কিসের জোরে? স্বাধীনতা? মুক্ত পাখির স্বাধীনতার জন্যে? হায়রে, এই কী স্বাধীনতা? নিজের উপার্জিত অর্থ দু'হাতে খরচ করার নামই কী স্বাধীনতা?

স্বাধীনতা! সুপ্রভা হেসে উঠ্‌লো প্রেতিনীর মতো। কী স্বাধীনতা পেলুম? মাস-মাস কতোগুলি রূপোর চাক্‌তি পেলেই যদি স্বাধীনতা পাওয়া যেতো, তাহ'লে হেড্ মিস্‌ট্রেস রমলাদি-ই তো রীতিমতো স্বাধীন। শ' দেড়েক মাইনে, খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে জীবনের সীমান্তের দিকে চলেছেন। যৌবন নিয়েছে বিদায়, চোখ হোয়েছে কোটরাগত। রংগের পাশে চুলের রঙ্ তামাটে। হাসেন—যেন মরায় হাস্‌ছে।

তা'র মাসিক যা উপার্জন, তা-ও তো সে নিজের জন্যে রাখেনি। ভা'য়েদের ইস্কুলের মাইনে, বোনের বিয়ের টাকা, সংসারের খরচ সে নিয়মিত দিয়ে আস্‌ছে। কোনো মাসে এক টাকা কম হ'বার জো নেই। কিন্তু, টাকা যে কোত্থেকে আসে! সমস্ত দিয়ে-থুয়ে যা' থাকে, তা'তে মানুষের মতো বাঁচা যায় না। তবু, সে তিন বছর দিয়ে আস্‌ছে। মা মাসের প্রথমে চিরাচরিত প্রথায় একবার কুশল সংবাদ নেন, শেষের দিকে অভাব-অনটনের ফিরিস্তি। সব স্বার্থপর! কা'দের জন্যে সে তা'র সুখের স্তূপে দেশলাই-এর কাঠি জেলে দিচ্ছে! কা'দের জন্যে সে প্রাণপাত কোর্‌ছে! তা'র জন্যে কে কতো কোর্‌ছে! নিজের জন্যেই বা সে কতো কোর্‌লো! ক'দিন থেকে শায়া দু'টো ছিঁড়েছে, কাপড় আর না কিন্‌লে চলে না। কিন্তু টাকায় কুলোয়নি। সবাই হাঁ কোরে তাকিয়ে আছে তা'র উপার্জনের দিকে। একেকবার তা'র ইচ্ছে কোরেছে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে। কিন্তু, ওদের মুখ চেয়ে সে তা' পারেনি। আর ক'দিন! তা'র তো সময় হোয়ে এলো!

সুপ্রভা চ'মকে ওঠে। সত্যিই কী তা'র সময় হোয়ে এলো না কি? আশ্চর্য কিছু নেই। বিয়ে হোয়েছিলো বাইশ বছর বয়েসে, আর এই পাঁচ বছর। মানে, সাতাশ বছর। রমলাদি'র মতো সে-ও তো বুড়ো হোতে চলেছে, তা'রও তো যৌবন অস্ত যেতে বসেছে। আর সময় কৈ? জীবনকে ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ কোরবার, ঐশ্বর্যবান কোরবার যে-বয়েস সে-বয়েস তা'র পার হোয়ে গেছে না কি? এ-জীবনের মতো তা'র সব নিবে গেলো নাকি, ফুরিয়ে গেলো? বাঙালির জীবন গড়পড়তায় কতোদূর? চল্লিশ! সাতাশ থেকে চল্লিশ কতো বছর? তেরো, তেরো বছর। সময় এতো সংকীর্ণ হোয়ে এসেছে! সে দেখতে পায়নি—সামনে কুয়াশা ছিলো, বুঝতে পারেনি। রঙিন পুরু কাচে চোখ গিয়েছিলো এঁটে। এমন সময় তা' খুলে গেলো যখন মোমবাতি পুড়ে-পুড়ে নিঃশেষিতপ্রায়।

তা'র স্পষ্ট মনে হ'লো স্থলতার কথা: 'বিয়ে না কোরে বড়ো ভুল কোরেছি, রমলাদি। ঘর বাঁধলুম না, কা'র জন্যে এই উপার্জন? কে খরচ কোরবে?'

রমলাদি কান্নার মতো কোরে হেসে বোলেছিলেন, 'নিজের দিকে চেয়ে ভাখ্। অনুশোচনাটা দু'দিন আগে জাগ্‌লে ভালো হোতো।'

সকলের জীবনে কী এই একই দীর্ঘশ্বাসের চলা-ফেরা? শিক্ষার মোহে, স্বাধীনতার স্বপ্নে যৌবনে যা'রা ভুল কোরে বসে—কোনো বিশেষ বয়েসে তা'দের মনে কী এই চিরন্তন ক্ষোভ ভূতের মতো হানা দ্যায়? তা'রো কী সময় যায়নি?

বৃষ্টির ছাঁটে কখন যে তা'র সর্বাংগ ভিজে গেছে, সুপ্রভা জান্‌তে পারেনি। ভূতে-পাওয়া লোকের মতো দ্রুত সে ঘরে পালিয়ে এসেছে, দাঁড়িয়েছে আয়নার মুখোমুখি; অন্ধকারে তা'কে প্রেতিনীর মতো মনে হোয়েছে। সমস্ত শরীর তা'র থরথর কোরে কাঁপছে। সেই অবস্থায় সুইচ্‌টা টেনে দিলে। এক মুঠো হ'লুদে আলোয় আয়নাটা ঝকমক কোরে উঠ্‌লো। আর নিজেকে দেখে তার আর্তনাদ কোরতে ইচ্ছে হচ্ছে; নিজেকে এতো কুৎসিৎ ত তা'র কোনোদিন মনে হয়নি। তা'র উপর, আজ আবার সে ট্রেয়লেট্ কোরতে ভুলে গেছে। ফলে, মুখের রেখাগুলো আরো উলঙ্গ ভাবে দেখা দিয়েছে। তা'র চুল রগের কাছে ধূসর হোতে সুরু কোরেছে—কপালটা রেখায় ভরা। চোখে কৈ সেই শ্রাবণ-রাত্রের মাদকতা? তা' ঘোলাটে—কুয়াশার মতো ঝাপসা। মুখটা পাণ্ডু—গালের আর ঠোঁটের রঙ্ মরার মতো ফ্যাকাসে—সে চামড়া টেনে-টেনে দেখ্‌তে লাগলো। তা'র কান্না পেলো চামড়ার আর সে-ই আগেকার নিটোল বাঁধুনি নেই দেখে। তা' ঢিলে, শিথিল, থলথলে।

সুপ্রভা আর সহ্য কোরতে পারে না—দু'হাতে মুখ ঢেকে সে বিছানার উপর ভেঙে পড়লো।

আশালতা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

আশালতা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

ঝড়ের আকাশ

বিশ্বনাথ চৌধুরী

(পূর্বানুবৃত্তি)

বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা। বারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে কৃষ্ণা রাজপথের জনতার দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল। কতদিন পরে আবার সে তার পরিচিত পৃথিবীকে দেখ্‌তে পেল,—এই আলো বাতাস আবার তার শরীরে এসে লাগ্‌ছে—এলোমেলো দু'একটা বৃষ্টির ফোঁটা, কতদিন পরে আবার বর্ষা নেমেছে। একটা সুমধুর আত্মীয়তার স্পর্শ! সমস্ত ক্লান্তি যেন ধুয়ে মুছে যায়; আচ্ছন্ন স্নায়ুগুলো ক্রমশ সতেজ হ'য়ে ওঠে।

প্রায় দেড়মাস পরে কৃষ্ণা সুস্থ হ'লো। এখনও সে যথেষ্ট পরিশ্রম কর্‌বার ক্ষমতা ফিরে পায়নি বটে কিন্তু আর তাকে বিছানা আঁকড়ে সকলের মুখ চেয়ে চুপ ক'রে শুয়ে থাক্‌তে হয় না, খুসি মতো এখন সে চলাফেরা কর্‌তে পারে। কৃষ্ণার ভাব্‌তেও ভয় করে, সে নাকি দিনের মধ্যেই দু'তিনবার প্রলাপ বক্‌তে বক্‌তে অজ্ঞান হ'য়ে যেত। সমস্ত শরীরে ইন্‌জেক্‌সনের ব্যথা এখনও যায়নি, তাকে যেন কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—ঘুমের মত একটা অস্পষ্ট স্মৃতি, সব কথা কৃষ্ণা মনে আন্‌তে পারে না—সব সময় আচ্ছন্ন ভাব নিয়ে পড়' থাক্‌তো, চোখ মেলে তাকাতেও যেন কষ্ট হ'তো তার।

হাসপাতাল থেকে যেদিন ফিরে আসে তখনও সে অন্যের সাহায্য ভিন্ন চলাফেরা কর্‌তে পারে না। কৃষ্ণা মনে মনে ভাব্‌লে, কেন সে একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে গেল না—আবার নতুন ক'রে জীবনের সঙ্গে পরিচয় হ'তো।

শরীরে নতুন রক্ত সঞ্চারিত হচ্ছে। বেঁচে থাকার আর এক সমস্যা। দুঃখের দিনে সে আশা কর্‌তো, স্বপ্ন দেখ্‌তো, অনেক কল্পনা ছিল তাঁর। এখন ধূলিরুক্ষ বাস্তব। আর স্বপ্নের অবকাশ নেই। এতদিন তার যা সম্বল ছিল সবই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। ভবিষ্যতের চিন্তা আবার যে তাকে নতুন ক'রে কর্‌তে হ'বে এ ধারণা কৃষ্ণার ছিল না।

এই যথেষ্ট হ'লো। আর এখানে নয়, কৃষ্ণা মনে-মনে ঠিক কর্‌লে। কিন্তু কোথায় বা সে যেতে পারে?

ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়ের কথা মনে হ'তেই কৃষ্ণা আপন মনে হেসে উঠলো। আশ্রয় নিতে পারে এমন একখানি কুঁড়েঘরও আর সেখানে অবশিষ্ট নেই। পিতৃপুরুষের পুণ্যভূমিতে হয়ত প্রদীপ জ্বালবার আর প্রয়োজন হয় না। বুনো জঙ্গল, শ্যাওড়া আর শটিগাছে শূন্য ভিটে এতদিনে হয়তো ঢাকা পড়েছে। কৃষ্ণা চলে' আসার সঙ্গে সঙ্গেই পৈতৃক ঘর দু'খানা

বিক্রী ক'রে শ্যামানাথ কোন এক সাধুবাবার চেলাগিরি জুটিয়ে নিয়েছিল, কৃষ্ণা সে-খবর জানতো।

তার মায়ের এত সাধের গড়ে'-তোলা স্কুল!—অনেক দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হ'য়েও তিনি যাকে অবহেলা করতে পারেন নি, সকলের চোখের আড়ালে অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে তিনি যাকে বাঁচিয়ে রেখে গেছেন, কৃষ্ণা তাকে রক্ষা করতে পারলো না! তখন যদি সে জেদ ক'রে কলকাতায় না আসতো! শূন্যদৃষ্টি মেলে কৃষ্ণা আকাশের দিকে চেয়ে রইলো, প্রবল বৃষ্টির ছাটে শাড়ীর একপ্রান্ত ভিজে উঠেছে, তার সেদিকে লক্ষ্যই নেই।

রাস্তায় গ্যাসের আলোগুলো ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে। মণিকাদি'র দল ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখে ফিরেছে। আর অন্ধকারে বসে' থাকা যায় না। কৃষ্ণা উঠে দাঁড়াল। ঘরে এসে অন্যমনস্ক হ'বার জন্যে একটা বই টেনে নিলে। কিন্তু হঠাৎ আলোটা নিভে যেতেই কৃষ্ণা একেবারে চম্‌কে উঠ্‌লো: 'কে?'

অন্ধকারে কোন সাড়া নেই। ভয় পেয়ে কৃষ্ণা নড়ে' বস্‌লো, এবার আর একটু জোর গলায় বল্‌লে, 'কে এখানে?'

উত্তরের পরিবর্ত্তে একরাশ রজনীগন্ধা তার গা'য় এসে পড়্‌লো।

কৃষ্ণার সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে। অন্ধকারে আর কিছু দেখা যায় না, শুধু একটা ছায়া যেন ঘরের মধ্যে সরে' সরে' যাচ্ছে।

কৃষ্ণা সুইচটা টান্‌তে গেল, পারলে না। কে যেন তার হাত সজোরে চেপে ধরেছে মনে হ'লো—দৃঢ় আকর্ষণে সে তাকে বুকের কাছে টেনে নিলে। আর সঙ্গে-সঙ্গে আলোটা জ্বলে' উঠ্‌লো।

ঘামে সমস্ত সেমিজটা প্রায় ভিজে উঠেছে। কৃষ্ণা ধমক দিয়ে বল্‌লে, 'কি সব সময় ছেলেমানুষি প্রতিমা,—আমার ভালো লাগে না।'

'অন্য কেউ হ'লে নিশ্চয়ই ভালো লাগ্‌তো।' একটু হেসে প্রতিমা বল্‌লে।

'না, তাও নয়।' কৃষ্ণা গম্ভীরভাবে বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগ্‌লো।

'আচ্ছা, তুমি কি ভেবেছিলে বলো ত?'

'কিছুই ভাবিনি।' কৃষ্ণা তেমনি নির্ব্বিকার কণ্ঠে বল্‌লে।

'আমি সমস্ত পথ কত কি মনে করে' আস্‌ছি—মার্কেট থেকে এই জন্যে ফুল কিন্‌লাম পর্য্যন্ত!' কৃষ্ণার পাশে ব'সে তার একটা হাত নিজের মুঠোয় বন্দী করে' প্রতিমা বল্‌লে।

'সমস্তই মাঠে মারা গেল দেখ্‌ছি।'

'তা কেন? যবনিকার অন্তরালে চলেছে মহলা—সত্যিকারের নাটক যেদিন সুরু হবে তখন যেন ভুল না করি।' প্রতিমা সনিশ্বাসে বল্‌লে।

'এখনও ত নিরাশ হ'বার সময় আসেনি প্রতিমা!'

'চারদিক চেয়ে ভরসা পাই কি করে' বলো?—অবিশ্যি তোমার কথা বল্‌ছি না!'

প্রতিমা একটু কটাক্ষ ক'রে হাস্‌লে। একটু থেমে আবার আরম্ভ করলে, 'একটা খবর তোমায় বলিনি বুঝি! একদম ভুলে গেছি বল্‌তে। ইন্‌ষ্টিটিউটে আমরা সেদিন প্লে করলাম। তুমি শোননি কিছু?'

'না বল্‌লে আর কি ক'রে শুন্‌বো?'

'রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'।—সত্যি, চমৎকার অভিনয় হয়েছিল। এই বয়সেও মিসেস দে'র উৎসাহ কম নেই দেখ্‌লাম। রুমলাকে নিয়ে কি যে করবেন ঠিক করতে পারেন না। Really She deserves that—জয়ন্তবাবু যেদিন ওকে সঙ্গে ক'রে আনেন সেদিন স্বপ্নেও ভাবিনি ও এত সুন্দর নাচতে পারে।' কৃষ্ণাকে কোন কিছু বল্‌তে না দেখে প্রতিমার উৎসাহ অনেকটা নিভে গেল।

একটু পরে বল্‌লে, 'ও কি, কি ভাব্‌ছো বলো ত? মাথা ধরেছে বুঝি?'

'না।' কৃষ্ণা বইটা রেখে বালিশে হেলান দিয়ে বল্‌লে।

'তবে চুপ করে' আছো কেন?'

কৃষ্ণা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বল্‌লে, 'আমি বোধ হয় চলে' যাচ্ছি প্রতিমা।'

প্রতিমা কথাটা শুনে যেন বিশ্বাস করতে পারলে না। উৎসুক কণ্ঠে বললে, 'কোথায়? কেন বলো ত?'

'কোথায় তা জানি না, কিন্তু যেতে আমাকে হবেই।'

'কেন যাবে তুমি?' প্রতিমা অনুনয়ের স্বরে বল্‌লে। কৃষ্ণা সে-কথার উত্তর দিলে না—দেয়ালে টাঙানো মায়ের ছবিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো।

প্রতিমা বল্‌লে, 'আমি জানি হস্‌টেলের আবহাওয়ায় তুমি হাঁপিয়ে উঠেছ, কিন্তু এদের কথাগুলো যদি উপেক্ষা করতে না পারো তাহ'লে এদেরই ত জয় হলো কৃষ্ণাদি'—তোমার এ পালিয়ে যাওয়ায় কোন সম্মান নেই জেনো।'

কৃষ্ণা মুহূর্ত্তের জন্য প্রতিমার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন বল্‌তে গিয়ে থেমে গেল। একটু পরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, 'তা নয় প্রতিমা, মফঃস্বলে একটা কাজের চেষ্টা দেখ্‌বো ভাব্‌ছি।'

'সত্যি বল্‌ছ? আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। জয়ন্তবাবুকেও কিছু জানাওনি বোধ হয়?'

'তাকে জানাবার কিছু দরকার আছে নাকি?' কৃষ্ণার ঠোঁটে ম্লান হাসির রেখা।

'নিশ্চয়ই আছে।'

'তুই ভুল করছিস প্রতিমা।' বাধা দিয়ে কৃষ্ণা বল্‌লে।

'না, ভুল আমি করিনি। তুমি জানো না, তাই ওকথা বল্‌ছো।' প্রতিবাদ ক'রে প্রতিমা উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বল্‌লে, 'অসুখের সময়কার কোন কথা বোধহয় তোমার মনে নেই?'

কৃষ্ণা অস্ফুট কণ্ঠে বল্‌লে, 'না।' তার দৃষ্টিতে অগাধ বিস্ময়।

'জয়ন্তবাবুর সাহায্য না পেলে তোমায় হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব হ'তো না—কতদিন তোমার জন্য ইউনিভারসিটিতে পর্য্যন্ত যেতে পারেন নি।'

'তার সাহায্য নেওয়া তোমাদের উচিত হয়নি।' শুষ্ক কঠিন গলায় কৃষ্ণা বল্‌লে।

'তোমার কথা সব সময় বুঝতে পারি না কৃষ্ণাদি'।' একটু থেমে আবার বল্‌লে, 'আমরা কিন্তু কখনও এতটা নির্ম্মম হ'তে শিখিনি।' প্রতিমা চলে' যাচ্ছিল, কৃষ্ণার ডাকে ফিরে তাকাল। কৃষ্ণা বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল। কি যেন বল্‌বে ভেবেছিল—কোন কথা তার মুখে এলো না।

প্রতিমা ডাক্‌লে, 'কৃষ্ণাদি'।'

'বলো।' মুখ না তুলেই কৃষ্ণা বল্‌লে।

'অশোক রায়কে তুমি চেন? যিনি বিলেত থেকে ডাক্তার হ'য়ে ফিরে এসেছেন?'

কৃষ্ণা এইবার সোজা হ'য়ে উঠে বস্‌লো।

প্রতিমা বল্‌লে, 'সেদিন ক্লাসের ছুটির পর জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা—আমাকে দেখেই বল্‌লেন, একটা সুখবর আছে। আপনার বান্ধবীকে বল্‌বেন—ডাক্তার রায় বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন।'

কৃষ্ণা অন্যমনস্কভাবে বললে, 'তারপর?'

'তারপর আর কি? এতদিন খবর দিতে পারিনি বলে' কিছু যেন মনে ক'রো না।' প্রতিমা কথাটা অসমাপ্ত রেখেই চলে' গেল।

ক্রমশ

সম্পাদকীয়

যুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষ

গত পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে য়ুরোপীয় যুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষ সুরু হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় বর্ষে এই মহাযুদ্ধ গ্রেট বৃটেন ও জার্মানীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়েছে। আবিসিনিয়া সোমালিল্যাণ্ডে, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে সিরিয়ার মরুভূমিতে মুসোলিনীর ফাসিস্ত বাহিনী যে রণ-লীলার অবতারণা করেছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নয় এই জন্যে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ধ্বংসলীলার প্রধান কেন্দ্র লণ্ডন ও বার্লিনের উপর। প্রথম বর্ষের যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা প্রসঙ্গে কতকগুলি বিশিষ্ট য়ুরোপীয় সংবাদপত্রে এই মর্মে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিকে নিঃসন্দেহে বৃটেনের পক্ষে জয়লাভের সম্ভাবনার অনুকূল বলা যায়। এ-ছাড়া, এই সব সংবাদপত্রের স্তম্ভে আছে প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রদত্ত জমকালো বিবরণ। অধিকাংশ বিবরণেই দেখা যায়, লণ্ডন ও বার্লিনের উপরকার বিমান-যুদ্ধে এ-পর্য্যন্ত বৃটিশবাহিনীর কৃতিত্বই প্রকটিত হয়েছে বেশি করে' এবং জার্মানীর ক্ষতির পরিমাণ আর নাকি নির্ণয় করা যায় না। অবশ্য, সবগুলি বিবরণই লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

জার্মানীর ক্ষতির অঙ্ক খতিয়ে দেখবার মতো সুস্থতা সম্প্রতি হিটলারের মস্তিষ্কে আছে কি না, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সে-কথা একেবারেই অবান্তর। তবে, এই সব ধুরন্ধর ভবিষ্যৎ-বক্তারাও এ-কথা ভেবে আশঙ্কিত হচ্ছেন যে, হিটলারের সেই বহুবিঘোষিত গোপন অস্ত্রের মারাত্মক প্রয়োগ এখনও বাকী আছে। এবং সে গোপন অস্ত্র হচ্ছে বারোটী টর্পেডোর সমান ধ্বংসশক্তি সম্পন্ন বিস্ফোরকে পরিপূর্ণ বেতারচালিত ক্ষুদ্র নৌকা। আধুনিক জড় বিজ্ঞানের কল্যাণে এই গোপন অস্ত্রের প্রতিষেধকও হয়তো বৃটেনের কারখানায় জন্ম নিচ্ছে; কিন্তু বিচক্ষণেরা বলেন, গোপন অস্ত্রের চেয়েও বৃটেনের প্রতিরোধ বেশি মারাত্মক।

এই প্রতিরোধ সফল হ'লেই প্রমাণিত হ'তে পারে যে, নাৎসী জার্মানী য়ুরোপ জয় করে' সমগ্র পৃথিবীর উপর তার আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হবে।

রুমানিয়া

বল্কানে যুদ্ধ হ'ল না, অথচ বল্কানের এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি তার প্রয়োজনীয় অঙ্গ হারিয়ে আরও দুর্বল ও ক্ষুদ্র হ'য়ে পড়লো। আশ্চর্য্য হ'তে হয় এই দেখে যে, রুমানিয়া মিত্র ভেবে যাদের শরণাগত হয়েছিলো, তারাই কৌশলে নিজেদের সুবিধে এবং স্বার্থের জন্য রুমানিয়ার শরীরে অপরকে ছুরি চালাতে দিয়েছে। রাশিয়াকে বেসারাবিয়া ও বুকোভিনার কিয়দংশ ছেড়ে দিয়ে রুমানিয়া হয়তো নিশ্চিন্ত হ'তে চেয়েছিলো, এতেই সে নিস্তার পাবে। কিন্তু হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া নিজেদের স্বার্থ-সম্পর্কে কম সচেতন ছিলনা।

বর্তমানে জার্মানী ও ইতালীর পক্ষে রুমানিয়াকে সাহায্য করা ত দূরের কথা, বল্কানে যুদ্ধ বাধলে উভয়েরই সমূহ বিপদ। সুতরাং, রুমানিয়া যা'তে হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়ার দাবী নির্বিবাদে পূর্ণ করতে বাধ্য হয়, তার জন্য রুমানিয়ার উপর বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে জার্মানী ও ইতালী চাপ দিতে এতটুকু ইতস্তত করেনি। ফলে, রুমানিয়া বুলগেরিয়াকে দোব্রুজ্জা ও হাঙ্গেরীকে ট্রান্সিলভেনিয়া উপহার দিয়ে আর এক গাল বাড়িয়ে আছে।

জার্মানী ও ইতালীকে অশেষ ধন্যবাদ, রুমানিয়ার অঙ্গচ্ছেদ বিনা রক্তপাতেই সমাধা হয়েছে। কিন্তু, এতেই কি বল্কান-অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে?

ভারতের স্বায়ত্তশাসন ও অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি

সম্প্রতি লেবার পার্টির কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্য অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় ভারতের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে যে আন্তরিক মন্তব্য ক'রেছেন তা' বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: '...বৃটেনের সমান অংশীদার স্বাধীন ভারতের উদ্ভবে সুবিধা প্রচুর। আফ্রিকায় ও মধ্য প্রাচ্যে জয়লাভের জন্য বড়লাট যে সাহায্য আদায় করতে পারেন, তার চাইতে জনবল ও সম্পদে অনেক বেশি সাহায্য ভারতের নিকট পাওয়া যাবে। ভারতীয়েরা যদি অসন্তুষ্ট থাকে তাহ'লে তা'রা আজ হোক্, কাল হোক্ অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা দমননীতি ডেকে আনবেই। আমরা যদি দমননীতি আবার চালাই তাহ'লে জগৎসমক্ষে আমাদের নিজেদের যে ক্ষতি হবে তা' একটা বড়ো যুদ্ধে পরাজয়ের সমতুল্য। আর শেষ পর্যন্ত, আমাদেরকে হার স্বীকার করতেই হবে। কারণ, একটা বিরাট্ জাতির অগ্রগতিতে কেউই সীমারেখা টানতে পারেনা।...'

ভারতের দাবী সম্পর্কে দায়িত্বশীল বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এখনও যদি অবহিত না হ'ন তাহ'লে বুঝতে হবে যে, তাঁরা প্রাচ্যে নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে একমাত্র তরবারীর শক্তিতেই বেশী আস্থা পোষণ করেন।

বাঙ্লায় শিক্ষার অবস্থা

বাঙ্লা গভর্ণমেণ্টের ১৯৩৮—৩৯ সালের শিক্ষা বিভাগীয় রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, বাঙ্লা দেশের সমস্ত বালক-বালিকা প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধা পাবে, এমন অবস্থায় যেতে এখনও অন্তত তিরিশ বছর দেরি। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিবেচনার জন্য ঐ বৎসর যে পরামর্শ-কমিটি গঠিত হয়, সে-কমিটী ছ' হাজার 'শিক্ষাপ্রাপ্ত গুরু' তৈরি করবার প্রয়োজনীয়তার প্রস্তাব করেছেন। এবং হক্ মন্ত্রীমণ্ডলী রীতিমতো উদারতা সহকারে এই প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করছেন বলে' প্রকাশ।

আলোচ্য বৎসরে বাঙ্লা গভর্ণমেণ্ট বে-সরকারী কলেজ গুলির জন্য ছ' লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন এবং এছাড়া কলেজ লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী প্রভৃতির জন্যও ব্যয় করেছেন প্রায় আশী হাজার টাকা। শিক্ষা বিস্তারের জন্য হক্-মন্ত্রীমণ্ডলীর এই উদ্যম-উদ্দীপনাকে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এর পরও সন্দেহের চোখে কটাক্ষ করছেন কেন, সেইটাই কিন্তু এখন গূঢ় প্রশ্ন।

চলচ্চিত্র

জে. বি.

এ কথা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই যে দৈনন্দিন অপরাপর প্রয়োজনের মতো সিনেমার আনন্দকেও আমরা আজ অপরিহার্য্য রূপে আবশ্যক মনে কচ্ছি। তার কারণ, সৌন্দর্য্য-শালিনী প্রকৃতির বহু বিচিত্র স্নেহ এই খরযৌবন বিংশ শতাব্দীতে নানা কারণে আমাদের জীবন থেকে শূন্য হ'তে চলেছে। আর, এই বিরাট প্রকৃতির বিচ্ছেদ আমাদের জীবনকে দিন-দিন যন্ত্রের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। যন্ত্রের আবহাওয়ায় বাস করে' যান্ত্রিক সুবিধার পূর্ণতম সুযোগ গ্রহণ না করা আজ একান্তই মূর্খতা,—অন্তত ব্যবহারিক জীবনের দিক থেকেও। চলচ্চিত্রকে তাই আমরা চিত্তের নির্ম্মল আনন্দ উপভোগের ব্যাপারে অঙ্গীভূত করেছি। এবং শুধু আনন্দ নয়, উন্নততর শিল্পের দিক্ দিয়েও পৃথিবীর বহু লোক আজ এ থেকে রুটি উপার্জ্জন করতে সমর্থ হচ্ছে। অবশ্য, ভারতবর্ষে এই শিল্পের প্রগতি ও প্রসার আজও শুধু অর্থ-আগমের সুলভতম পন্থা ও প্রক্রিয়ার মধ্যে নিবদ্ধ আছে। মোটা রকমের লাভ ও মোটামুটি আনন্দ-লাভের উপকরণ ছাড়া ত্রুটিহীন শৈল্পিক পরিণতি ও সিদ্ধির জন্য যে পরিমাণ সাধনা ও প্রেরণার প্রয়োজন তা' এখনো এই শিল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মনে জন্ম লাভ করে নি।

যাহোক দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষও চলচ্চিত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। তবে, এখনও এক শ্রেণীর সংস্কারাচ্ছন্ন লোক আছেন যাঁরা এই শিল্প সম্বন্ধে সবিশেষ কোনো শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠা পোষণ করেন না। এবং এই শ্রেণীর লোক বেশীর ভাগই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এঁদের ধারণা, চলচ্চিত্রের আবহাওয়া উঁচুস্তরের শিল্পসৃষ্টির অনুকূল নয় আদৌ। ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগত এই অভিযোগের আংশিক সাক্ষ্য বহন করলেও, ও-দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে চিত্তপ্রকর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন হিসেবে সিনেমা এক বিস্তৃত আসন লাভ করেছে। এ ছাড়াও, ও-দেশের জনপ্রিয় পর্দা আজ সত্যিসত্যিই সামাজিক শুভকীর্ত্তি। অবশ্য এর একমাত্র কারণ, ওদেশ সিনেমাকে শিল্পকলা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সেই শিল্পসৃষ্টিতে কৃতবিদ্য লোকদের সমাবেশ ঘটেছে।

এদেশের ষ্টুডিয়ো সেকালের থিয়েটারী হুল্লোড় ও একদল অশিক্ষিত সবজান্তাদের লীলাভূমি হিসেবেই গণ্য হ'য়ে এসেছে। এবং সে-কারণেই শিক্ষিত সম্প্রদায় এই শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দেখাতে কুণ্ঠিত ছিলেন।

সম্প্রতি একটি শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে প্রযোজকরা সবজান্তা পরিচালক ও পার্শ্বচরদের উপদেশ ও আন্দোলন অগ্রাহ্য করে' শিক্ষিত লোকদের, বিশেষ করে' সাহিত্যিকদের চলচ্চিত্রের আসরে টানছেন। প্রযোজকদের এই অনুপ্রেরণা সত্যই প্রশংসার্হ। ভালো গল্প ও চিত্রনাট্যের জন্য যেমন সুসাহিত্যিক প্রয়োজন তেমনি উৎকৃষ্ট আলোকচিত্র, যথাযথ শব্দগ্রহণ ও অন্যান্য

বিভাগের জন্য শিক্ষিত ও দক্ষ লোকের প্রয়োজন। শুধু-দু'একটী সাহিত্যিককে ছোলা-ছাতু দিয়ে পোষণ করলেই প্রযোজকদের কর্ত্তব্য শেষ হ'লনা।

চিত্র-পরিচিতি

সুসাহিত্যিক আছেন, তাঁর গল্প ও চিত্রনাট্য আছে, তবুও ছবি উঁচু পর্য্যায়ে পৌঁছুতে পারলো না—এর উদাহরণ মতিমহল থিয়েটার্সের ব্যবধান চিত্রখানি। তার কারণ, অন্যান্য বিভাগে অপটু লোকের নিয়োগ ও শিল্পী-নির্ব্বাচনে পরিচালকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা।

যদিও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাহিনীতে এতটুকু শিল্পকারুকার্য্য বা অসাধারণ কোনো চরিত্র-সৃষ্টি নেই, তবুও মোটামুটিভাবে ছবিখানি অন্তত নিভুল ঘটনাসমাবেশে, ঠাস বুনোনিতে, অভিনয় সৌকর্যে কিছুটা উৎরোতে পারতো। কিন্তু তা' হবার যো নেই,—সাফল্যের পথ রোধ করে' আছে তথাকথিত সবজান্তার দল।

পৌরুষ-বর্জ্জিত ভূমিকাটিতে ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের নির্ব্বাচন অন্তত: সমর্থন করা যায়। কিন্তু অভিনয়ের দিক দিয়ে তিনি সাফল্যের কোনো ইঙ্গিতই দিতে সমর্থ হন নি। অস্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক হওয়ার প্রচেষ্টায় 'নমিতা'র ভূমিকায় প্রতিমা দাশগুপ্তার অভিনয়ও ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ-হানার কুৎসিত অভ্যাসকে পরিচালকের সর্ব্বাগ্রে সংশোধন করা উচিত ছিলো।

এ-দেশের ষ্টুডিয়ো-সংবাদ

নিউ থিয়েটার্স লিঃ -

সম্প্রতি নীতিন বসু যে-ছবির পরিচালনা করছেন তার নামকরণ হয়েছে 'পরিচয়।' 'পরিচয়ে'র পরিবেশক নিযুক্ত হয়েছে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন।

অমর মল্লিক পরিচালিত সামাজিক চিত্র 'অভিনেত্রী' আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর রূপবাণী চিত্র-গৃহে মুক্তিলাভ করবে বলে' স্থির হয়েছে।

ইষ্ট মুভিটোন

নিরঞ্জন পাল এখানে যে ছবিখানা পরিচালনা করছেন তার নামকরণ হয়েছে 'রাস-পূর্ণিমা।' এঁদের আর একখানি বাঙলা ছবি 'শকুন্তলা'র প্রাথমিক অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। 'শকুন্তলা'র কাহিনী রচনা করেছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। পরিচালনা করছেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ন্যাশন্যাল ষ্টুডিয়ো

বম্বের ন্যাশন্যাল ষ্টুডিয়ো বর্ত্তমানে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীনে'র চিত্ররূপ দিচ্ছেন। ছবিখানির নামকরণ হয়েছে 'ভুল'।

সম্পাদক : বিরাম মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চৌধুরী
১৩নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড হইতে প্রকাশিত ও ১২২, বৌবাজার ষ্ট্রীটের 'আর্থিক জগৎ প্রেস' হইতে মুদ্রিত। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : বিরাম মুখোপাধ্যায়